বঙ্কিমচন্দ্রের

চন্দ্রশেখর

[ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত]

অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

সম্পাদিত

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

১০নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্‌,

কলিকাতা-১২

১৯৬০

ভূমিকা

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমিকা

চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কিন্তু যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপন্যাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমাদের দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ পরিচিত অধ্যায়। নবাবী শাসনের দুর্ব্বলতা ও নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ লইয়া দেশের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার জন্য ইংরেজ বণিকশক্তি ধীরে ধীরে হাত বাড়াইতেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর একদিকে যেমন দেশবাসীর নৈতিক বল ও আত্মপ্রত্যয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তেমনি ভাগ্যলক্ষ্মী যে ইংরাজ জাতির উপর সুপ্রসন্ন এ ধারণাও দেশবাসীর মনে ক্রমেই দৃঢ়তর হইতে-ছিল। এইরূপ এক সন্ধিক্ষণে বাংলার হতভাগ্য নবাব মীর কাসেম ইংরেজের সর্ব্বগ্রাসী লোলুপতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। সেদিন জয়লাভের বিশেষ কোনও আশা ছিল না, অভিজাত-শ্রেণী বিরূপ, দেশের সাধারণ লোক উদাসীন, ঘরভেদী বিভীষণে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু এই দুষ্টগ্রহকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নবাব শেষ চেষ্টা করিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা, পর পর কয়েকটি যুদ্ধে মীর কাসেমের পরাজয় উপন্যাসের ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনা, দেশের ভাগ্যবিপর্য্যয়কারী যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি উপন্যাসে কোনও প্রাধান্য লাভ করে নাই।

কিন্তু ইতিহাস এই উপন্যাসখানির কেবল পটভূমিকাই নয়, ইতিহাসের ঘটনা পাত্রপাত্রীর জীবনে দুর্ঘটনা হইয়া দেখা দিয়াছে, যুগসন্ধির এই রাষ্ট্রবিপ্লব পারিবারিক জীবনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার সুখ-দুঃখ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। রাজনৈতিক আকাশে যে ঝড় উঠে তাহা কেবল সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বকেই বিধ্বস্ত করিয়া শেষ হইয়া যায় না, শান্তিময় পল্লীর নিরুদ্বেগ জীবন হইতে কুলবধূকেও সবলে আকর্ষণ করিয়া আনে, অসূর্য্যম্পশ্যা রাজমহিষীকে অসহায়ভাবে পথে দাঁড় করাইয়া দেয়। রাজনীতির আবর্ত্ত হইতে যে হলাহল উঠিয়াছে চন্দ্রশেখর উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রীর জীবনে সে বিষ স্পর্শ করিয়াছে, গল্পের মধ্যে যে বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে সে বেগ আসিয়াছে ইতিহাসের রথচক্রের গতিবেগ হইতে, যে জটিলতা দেখা দিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হইতে উদ্ভূত। কেবল পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসকে গ্রহণ করেন নাই, ইতিহাস সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কাহিনী রচনা করিয়াছে,

সাধারণ চরিত্রকেও অসাধারণ করিয়া তুলিয়াছে, একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের সংক্ষুব্ধ তরঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সাধারণ মানুষের জীবনেও শৌর্য্যবীর্য্য মহত্ত্বের বিচিত্র বর্ণচ্ছটাময় বিকাশ দেখাইয়াছে।

তবু চন্দ্রশেখর ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস করিয়া গড়িতে চান নাই। ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে সাজাইয়া, তথ্যের অভাবকে কল্পনা দ্বারা পূর্ণ করিয়া, একটা যুগের হৃৎস্পন্দনকে ধরিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। লরেন্স ফষ্টরের দুঃসাহস, গুরুগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা, জন্‌সন্ ও গলষ্টনের সবুট পদাঘাত, আমিয়টের যুদ্ধ, জগৎশেঠের প্রাসাদে নৃত্যগীতের অন্তরালে চক্রান্ত—এ সমস্তই এত নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, এইগুলি ঐতিহাসিক কল্পনা-রসে জীবন্ত হইয়া নিত্য ইতিহাসের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবুও চন্দ্রশেখরকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্য্যাদা দেওয়া সঙ্গত হইবে না। এক মীর কাসেম ছাড়া অপর কোনও চরিত্রকে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবভাবনা বিচলিত করে নাই—ইতিহাসের রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছে মীর কাসেম ও দলনী, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী সকলেই কিন্তু রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়াছে ইংরেজ। কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর গিরিয়ায় যখন নবাবের ভাঙা কপাল আবার ভাঙিল তখন শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নবাব উদয়নালায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন দেখিতে পাই। যে সাম্রাজ্য স্খলিত হইয়া যাইতেছে, এত যত্নেও যাহা টিকিল না, তাহার জন্য নবাবের আর ক্ষোভ নাই। যে সাম্রাজ্য বিনা যত্নেও থাকিত অথচ ভাগ্য দোষে নবাব যাহা হারাইলেন তাহার জন্যই নবাবের শোক। ইংরেজের কামানের গোলা যখন নবাবের শিবিরে আসিয়া পড়িতেছে তখনও নবাব দলনীর চিন্তায় বিভোর। ইতিহাসের ঘটনা তীব্র বেগে যখন চরম পরিণামের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে তখন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া দলনী ও শৈবলিনীর নিষ্পাপত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য লেখক প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনী, বাল্যপ্রণয়ীকে স্মরণ করিয়া বিবাহিতা নারীর স্বামিগৃহত্যাগ—ইহা ইতিহাস-নিরপেক্ষ, কোনও বিশেষ সময়ের ইতিহাসের ইহা অপেক্ষা রাখে না। মীর কাসেম ও দলনী বেগমের যে গৌণ কাহিনীটি উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে তাহার সহিত সেদিনের রাজনীতির যোগও তেমনি নিবিড় নয়। ইতিহাস চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপের কাহিনীর উপর একটি অপূর্ব্ব মহিমা বিস্তার করিয়াছে। এইরূপ একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ না পাইলে দলনী বেগমের বিষপানে আত্মহত্যার কাহিনীটি আরব্য উপাখ্যানের সাদৃশ্য লাভ করিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা রোমান্সের খাতিরে ইতিহাসকে যতটুকু প্রয়োজন গ্রহণ করিয়াছে,

কাহিনী ও চরিত্রের অনুরোধে ইতিহাস নিঃশব্দে অনুসরণ করিয়াছে, ইতিহাস কোনও খানেই কাহিনী ও চরিত্রের উপর দিয়া বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

চন্দ্রশেখর রোমাণ্টিক উপন্যাস

চন্দ্রশেখর যেমন খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, তেমনি আবার খাঁটি সামাজিক উপন্যাসও নয়। ইহাতে সামাজিক সমস্যা আছে, সে সমাজও অতি প্রাচীনকালের নয়। এখন হইতে তখনকার ব্যবধান মাত্র দুইশত বৎসর। প্রধান কাহিনীটির মূলে একটি পরিচিত সামাজিক বা পারিবারিক সমস্যার কথাই আছে, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেরও অভাব নাই। কিন্তু উপন্যাসে আমাদের পরিচিত নরনারী যুগসন্ধির দারুণ বিক্ষোভের মধ্যে যোদ্ধবেশ ধারণ করিয়া পাঠকের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপন্যাসের ঘটনা-সমাবেশ ও পরিবেশ-সৃষ্টি উপন্যাসখানিকে কাব্য-ধর্ম্মী ও রোমান্টিক করিয়াছে, পুরাপুরি সামাজিক উপন্যাস হইতে দেয় নাই। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কথা বা রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক যোগবলের বৃত্তান্ত ছাড়িয়া দিলেও উপন্যাসের মধ্যে আরও কয়েকটি স্থান আছে, এমন ঘটনার বর্ণনা আছে যাহা ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রোমান্সেই শোভা পায়, বাস্তবের গদ্যময় জীবনে যাহা মানায় না। বঙ্কিমের কল্পনা পাঠককে যেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে, পাঠকের মনও বিনা প্রতিবাদে সেখানেই গিয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী কর্ত্তৃক বন্দী প্রতাপের উদ্ধার, ইংরেজের নৌকা পিছনে রাখিয়া গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর অবাধ সন্তরণ, অলক্ষিত থাকিয়া রমানন্দ স্বামীর সর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিতি আমাদের মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ আনিয়া দেয়। গল্প হিসাবে এই অংশগুলির আকর্ষণ এত প্রবল, দৃশ্য হিসাবে এইগুলি এত উজ্জ্বল যে, পাঠকচিত্ত পড়িতে পড়িতে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, বিদ্রোহ করিতে ভুলিয়া যায়। চন্দ্রশেখর পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র হইলেও ইহাতে বাস্তব জীবনের চিত্র ও ব্যাখ্যা প্রধান হইয়া উঠে নাই, মানুষের জীবনের অসাধারণ মুহূর্ত্তগুলি কল্পনার রঙে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

উপন্যাসের মুখ্য ও গৌণ কাহিনী

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের দুইটি কাহিনী। ইতিহাসের সঙ্গে যে কাহিনীটির প্রত্যক্ষ যোগ সে কাহিনীটি মুখ্য নয়। প্রধান কাহিনীটি শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের কথা। এই কাল্পনিক কাহিনীটির সঙ্গে পাশাপাশি চলিয়াছে মীর কাসেম, দলনী, গুর্‌গণ খাঁ, জগৎশেঠ প্রভৃতিকে লইয়া ঐতিহাসিক কাহিনী। ইহার ফলে

প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর প্রভৃতি চরিত্র ঐতিহাসিক ঘটনাজালের সহিত জড়িত হইয়া অনন্যসাধারণতা লাভ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ দেশের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অপ্রত্যাশিত বিষয়গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। দলনী ও মীর কাসেমের কাহিনীটি প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের কাহিনীর সহিত কোনও নিবিড় ঐক্যে গ্রথিত হয় নাই, বাহিরের যোগ ব্যতীত কাহিনী দুইটির ভিতর অন্তরের কোন যোগ নাই—এই মত অনেক সমালোচক পোষণ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসেই দুইটি কাহিনীর অবতারণা আছে এবং বাহিরের যোগ ছাড়া অন্তরের যোগও উহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মীর কাসেম-দলনীর কাহিনীটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ একটি করুণ কাহিনী; একই পরিবেশের মধ্যে দুইটি কাহিনীকে রচনা না করিয়া দলনীর কথা লইয়া স্বতন্ত্র একটি উপন্যাস রচনা করা যাইত সন্দেহ নাই।

উভয় কাহিনীর ভাবগত ঐক্য

কিন্তু দলনীর কাহিনী ও শৈবলিনীর কাহিনীর নিবিড়তর ঐক্য আছে। যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহা দলনীকেও তাহার নিরাপদ অন্তঃপুর হইতে টানিয়া আনিয়াছে। উভয়ের গৃহত্যাগের মূলেই ভ্রান্তি—হিসাবে ভুল। এই গৃহত্যাগ করার পর হইতে উভয়ের ভাগ্যেই নিত্য নূতন দুর্দ্দশা। এই গৃহত্যাগের ছিদ্র দিয়াই উভয়ের দাম্পত্য জীবনের বিপর্য্যয় ঘনীভূত হইয়াছে। এই দিক হইতে চিন্তা করিয়া অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের গঠন কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন।

দলনীর ভ্রান্তি অবশ্য অন্য প্রকৃতির। স্বামীর হিতাকাঙ্ক্ষাই তাহাকে দুর্গের বাহির করিয়া তাহার অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গুরূগণ খাঁর ষড়যন্ত্রে যখন তাহার দুর্গে পুনঃপ্রবেশ বন্ধ হইয়া গেল, চন্দ্রশেখরের আশ্রয় তখন তাহার নিকট একান্ত নিরাপদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমিয়টের লোক আসিয়া শৈবলিনী ভ্রমে তাহাকে সেখান হইতে লইয়া গেল। ইহাতে তাহার হাত নাই; চরম বিপদের সময় কুলসম তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। এদিকে যুদ্ধের গোলমালে সময়মত তাহার সন্ধান না লইয়া ও পরে তাহাকে না পাইয়া মহম্মদ তকি দলনী সম্বন্ধে এক গল্প রচনা করিয়া নবাবের নিকট লিপি পাঠাইল। রমানন্দ স্বামীর উপদেশ অনুসারে দলনী যদি স্বামি-সন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল না হইয়া অপেক্ষা করিত তবে হয় তো সকল অমঙ্গলের অবসান হইত। মিথ্যা

সংবাদ নবাবকে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিল। উপর্য্যুপরি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বিকৃতবুদ্ধি নবাব এত বড় মর্ম্মান্তিক অভিযোগের কোন অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না, চরম আদেশ দান করিলেন।

এই রূপই হয়—ইহাই যে দলনীর নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পরিণাম। যে জালে সে জড়াইয়া পড়িল, তাহার সাধ্য কি যে সে নিষ্কৃতি পায়! কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে সে দুর্গের বাহিরে পা দিয়াছিল। সেই যে সে অকূলে ভাসিল, আর তাহার অদৃষ্ট কূল পাইল না। নিয়তি কেবল তাহাকে নূতনতর বেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার প্রিয়তমের নির্দ্দেশে তাহাকে বিষপান করিতে হইয়াছে। শৈবলিনীর জীবনের দুর্দ্দশার মূলে শৈবলিনীর নিজের দায়িত্ব ছিল প্রচুর। কিন্তু দলনী আপনার অজ্ঞাতসারে নিজের দুর্ভাগ্যকে আমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার প্রতি আচরণ দৈববশে কঠোরতর বিপদকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নিয়তির আধিপত্যের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, কিন্তু নিয়তির এতখানি নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি তিনি কপালকুণ্ডলা ব্যতীত অন্য কোন চরিত্রে করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

এইবার উপন্যাসের মুখ্য গল্প—শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের কাহিনীর স্তর বা পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর দুর্দ্দম প্রেম এই উপন্যাসের মূল। শৈশব ও বাল্যের একান্ত অন্তরঙ্গতা তাহাদের হৃদয়কে এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছিল! কিন্তু ভাগ্য আসিয়া তাহাদের পৃথক করিয়া দিল। ইহজগতে মিলনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাহারা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে সঙ্কল্প করিল। কিন্তু প্রতাপ যখন ডুবিল শৈবলিনীর মনে সংশয় জাগিল, তাহার মরা হইল না। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে উদ্ধার করিলেন ও শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না। তাহার দুর্দ্দম প্রকৃতি এই কামনাকে লইয়া পাগল হইয়া উঠিল। স্বামিগৃহের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ রহিল না। প্রতাপকে পাইতে পারিবে এই আশায় সে লরেন্স ফষ্টরের সহায়তায় গৃহত্যাগ করিল।

এই গৃহত্যাগই তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভ্রান্তি। সে মনে করিয়াছিল যে, কোনও প্রকারে একবার প্রতাপের কাছে যাইতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে। এই বিশ্বাস লইয়াই সে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে বরণ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

কিন্তু প্রতাপকে সে চিনিতে পারে নাই বা পারিলেও তাহার উন্মত্ত কামনা

তাহার আশাকে এমন একটা প্রচণ্ড শক্তি ও আবেগ দান করিয়াছিল যে, সে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। প্রতাপের প্রত্যাখ্যানে সে আশা নির্ম্মূল হইয়া গেল। সে প্রতাপকে তাহার অটল দৃঢ়তা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। প্রতাপ তাহাকে ভুলিবার জন্য শপথ করাইয়া লইল। ইহার পর কঠোর অনুতাপের মধ্য দিয়া শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল ও বিষম অন্তর্দ্দাহের পর চিত্ত বিশুদ্ধ হইল। প্রতাপ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী

(প্রথম পর্য্যায়)

গঙ্গায় যেদিন প্রতাপ ও শৈবলিনী ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল—তাহার আট বৎসর পরে আখ্যায়িকার আরম্ভ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রতাপ বা শৈবলিনীর ব্যক্তিগত জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার কোনও উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্র করেন নাই। আটবৎসর পরে যখন যবনিকা উত্তোলিত হইল, তখন আমরা ভীমা-পুষ্করিণীতে স্নানরতা শৈবলিনীকে দেখিতে পাই। সরলা গ্রামবালিকার কোমলতা তাহার মধ্যে ছিল না, তাহার প্রকৃতির মধ্যে যেন একটা বন্য দুঃসাহসিকতা আসিয়াছে। লরেন্স ফষ্টরকে দেখিয়া সুন্দরী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গেল, কিন্তু শৈবলিনী তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিতে লাগিল।

শৈবলিনীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল তাহার প্রকৃতির দুর্দ্দমতার পরিচয়ই দিয়াছেন। এই দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া সে যে কিভাবে তাহার প্রেমকে তাহার হৃদয়ে একান্ত গোপনে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে তাহার হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের জন্য অনুশোচনা কিভাবে তাহার হৃদয়কে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়াছে, অসাধারণ পণ্ডিত স্বামীর বর্ণহীন প্রেম কিভাবে তাহার অন্তরে সংসারের প্রতি গভীর বৈরাগ্য আনিয়া দিয়া প্রতাপের প্রতি উপচীয়মান প্রেমকে প্রশ্রয় দিয়াছে—তাহার পরিচয় আমরা প্রথমে পাই না। এমন কি সুন্দরী যখন নাপিতানীর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহাকে ফষ্টরের বজরা হইতে কৌশলে মুক্তি দিতে চাহিয়াছে, তখন তাহার পলায়নে অস্বীকৃতি আমাদের মনে এক অজ্ঞাত বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে মাত্র, কিন্তু শৈবলিনী চরিত্রের কেন্দ্রগত ভাবটির দিকে একটুও আলোকপাত করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একটু একটু করিয়া তাহার হৃদয়কে প্রকাশিত করিয়াছেন। রহস্যময়ী নারী আপনার অন্তরে কাহার জন্য সুধা সঞ্চয় করিয়া

রাখিয়াছে, প্রতাপের সহিত তাহার সাক্ষাতের পূর্ব্বে, প্রতাপের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা সহসা অনুমান করিতে পারি না। প্রতাপের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকারোক্তিই তাহার পূর্ব্বতন কার্য্যধারার সকল রহস্য অপনোদন করিয়া দেয়।

প্রতাপের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই যে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু বাহির হইতে অবলম্বন না পাইলে তাহার প্রেম এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। ব্যর্থতার জ্বালায় তাহা হয় তো গৃহকোণে অন্তরেই গুমরিয়া মরিত। লরেন্স ফষ্টর তাহার এই প্রেমকে জ্বলিয়া উঠিবার সহায়তা করিয়াছে। শৈবলিনীর প্রকৃতির মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল তাহা শত ফষ্টরের সহস্র প্রলোভনকে উপেক্ষা করিতে পারে। সে ফষ্টরের সহিত গৃহত্যাগকে প্রতাপকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করায় ফষ্টরের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়া চন্দ্রশেখরের গৃহ ত্যাগ করিয়াছে। প্রতাপ আসিয়া হঠাৎ উদ্ধার না করিলে আমরা কল্পনা করিতে পারি আরও অনেক দিন সে ফষ্টরকে তাহার হস্তের ক্রীড়নক করিয়াই রাখিতে পারিত।

প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতাপের নিকট শৈবলিনীর আত্মপ্রকাশ পর্য্যন্ত প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর কাহিনীর প্রথম পর্য্যায়! নূতনতর বহিরাগত ঘটনার সংঘাতে কাহিনী যদি জটিলতর না হইয়া উঠিত, তবে এইখানেই কাহিনীর নাটকীয়তা চরম রোহণ বা climax লাভ করিত।

শৈবলিনীর উদ্ধারের পর কাহিনীর মোড় ঘুরিল; প্রতাপ ধৃত ও বন্দী হইল এবং ঘটনাক্রমে নবাবের সম্মুখে দলনী ভ্রমে আনীত শৈবলিনী প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া প্রতাপের উদ্ধারের জন্য নবাবের সহায়তা প্রার্থনা করিল।

শৈবলিনীর দুরাশা যে তাহাকে কতদূর অগ্রসর করিয়াছে, এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যায়। নবাবের নিকট সে আপনাকে প্রতাপের স্ত্রীরূপে পরিচয় দিয়াছে। তাহার আশাই তাহাকে প্রতাপকে মুক্ত করিবার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছে। শৈবলিনীকে প্রতাপ ইহার পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছিল, শৈবলিনীর মুখে প্রতাপের প্রতি প্রেমাবেগের প্রকাশও প্রতাপকে টলাইতে পারে নাই। শৈবলিনী মনে করিয়াছিল (শৈবলিনীর সব হিসাবই ভুল) সে যদি শত্রুহস্ত হইতে প্রতাপকে উদ্ধার করিতে পারে তবে অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার খাতিরেও উদ্ধারকারিণীর প্রতি প্রতাপ নিরূপ হইতে পারিবে না, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। প্রতাপকে মুক্ত করিতে

পারিলে প্রতাপ তাহার হইবে। এই আশা যে ব্যর্থ হইবে, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই।

(দ্বিতীয় পর্য্যায়)

কিন্তু আশাভঙ্গের সময় আসিল। বজরা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়ন করিবার সময় গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে দিতে প্রতাপ ডুবিয়া মরিবার ভয় দেখাইয়া তাহাকে ভুলিবার জন্য শপথ করাইয়া লইল। শৈবলিনীর সকল আশা ফুরাইল।

ইহাই প্রতাপ-শৈবলিনীর দ্বিতীয় পর্য্যায়। এইখানেই যবনিকা টানিয়া দিয়া কাহিনী শেষ করিলে শিল্পকলার দিক দিয়া তাহা অনিন্দ্য হইত। একটি প্রণয়বিমূঢ়া নারী অসম্ভব এক দুরাশা হৃদয়ে লইয়া গৃহকোণ ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; পথে তাহার নানা বাধা-বিপত্তি। তবু সে সমস্ত বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করিয়া তাহার প্রিয়তমের কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্যে উপনীত হইয়া সে দেখিতেছে যে, এতকাল এক দুরাশার পিছনেই সে ছুটিয়া আসিয়াছে। পাথরে মাথা খুঁড়িলেও হয় তো পাথর ভাঙ্গিত, কিন্তু প্রতাপ পাথরের চেয়েও কঠিন। সামাজিক সম্বন্ধই শৈবলিনী ও প্রতাপের মিলনের বাধা নয়। প্রতাপ তাহার ব্যর্থ প্রেমের ভার আজীবন বহিয়া চলিবে তবুও শৈবলিনীর প্রলোভনকে সে চিরকাল দূরে ঠেলিয়া রাখিবে। ইহা চন্দ্রশেখরের উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা নয়। তাহার প্রকৃতির মধ্যে নীতিবোধের দৃঢ় একটি আবরণ ছিল। শৈবলিনীর প্রেম তাহাতেই প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই দুরাশা-প্রবঞ্চিতা নারীর জীবনের ব্যর্থতা ট্রাজেডীর উপজীব্য বিষয় এবং চরম আশাভঙ্গে এই ট্রাজেডীর উপর যবনিকাপাত সাহিত্য-কলার দিক দিয়া যে সুন্দর ও শোভন হইত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত

কিন্তু নিছক সাহিত্য সৃষ্টি করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমালোচকগণের উদ্দেশ্যে নিজেই বলিয়াছেন—'কাব্যগ্রন্থ মনুষ্য জীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র; এ কথা না বুঝিয়া যিনি কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হই।' বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার প্রেরণা আসিয়াছে মানবের অদৃষ্ট ও মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান হইতে এবং সাহিত্য সাধনায় তিনি স্বজাতি, স্বদেশ ও সমাজের প্রতি তাঁহার

দায়িত্বের কথা ভুলিতে পারেন নাই। "যে জ্ঞান তত্ত্ব মাত্র, যে ধর্ম্ম শুষ্ক তর্ক মাত্র, এবং যে কাব্য আর্ট মাত্র, বঙ্কিম তাহাকে বরণ করেন নাই—বুঝিতেন না বলিয়া নয়, তিনি তাহা চান নাই, তাঁহার প্রাণ নিষেধ করিয়াছে।" সেইজন্যই তিনি আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ ও অপমানের মধ্যে উপন্যাস শেষ না করিয়া তাহাতে এক নূতন পর্য্যায় সন্নিবেশ করিলেন। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সেই নূতন পর্য্যায়ের বিষয়বস্তু।

শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর উপন্যাসে বঙ্কিমের উপস্থাপিত পারিবারিক সমস্যার স্বরূপটি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল এই দুইখানি সামাজিক উপন্যাসে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন পত্নীর পাতিব্রত্য ও প্রেম বিপথগামী স্বামীকে একদিন না একদিন ফিরাইয়া আনিয়াছিল; দাম্পত্য ধর্ম্মের, স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধের উৎকর্ষ এইখানেই। একজনের পতন বা পদস্খলন হইলেই দম্পতির সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। শৈবলিনী অপরাধ করিয়াছিল, কিন্তু স্বামী যদি এ অপরাধ ক্ষমা না করে তবে কে করিবে? আর গৃহধর্ম্ম সকলের চেয়ে বড়, এই ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইলে অকল্যাণ হয়, সামাজিক সমস্ত বন্ধনের মূলে এই গৃহধর্ম্ম। প্রয়োজন হইলে বহুর কল্যাণের বেদীমূলে ব্যক্তিগত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতে হয়। বাল্য প্রণয়কে দাম্পত্য ধর্ম্মের উপর স্থান দেওয়া চলিবে না। চন্দ্রশেখর উপন্যাসের গল্পের মধ্য দিয়া এই সমস্যাটির সমাধান দেখানো হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শৈবলিনীর স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সার্থকতা এইখানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বিবাহিতা নারীর গৃহত্যাগ লইয়া সাহিত্য রচনা করা অভাবনীয় ছিল; বঙ্কিম সাহিত্যে আর একটি নারী অতৃপ্ত কামনার আগুন বুকে লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু রোহিণীর গৃহত্যাগ স্থূল ভোগ-পরায়ণতার নিদর্শন; প্রেমের যে দীপ্ত রাগ শৈবলিনীর মনকে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল রোহিণী চরিত্রে তাহার নিতান্তই অভাব, রোহিণীর পরবর্ত্তী জীবন তাহার প্রমাণ। কিন্তু শৈবলিনীর ভালবাসার অপরাধ কোথায়? জ্ঞান হইবার পর হইতেই যাহাকে প্রাণ মন দিয়া ভালবাসিত তাহার স্মৃতি সে ত্যাগ করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু বিবাহিতা নারীর পক্ষে কোনও অবস্থাতেই স্বামীর গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। সমাজের চক্ষে, বাহিরের লোকের চক্ষে এই অপরাধ গুরুতর। বিবাহিত জীবনের একটা দায়িত্ব আছে। বাল্য-প্রণয়ের স্মৃতি ধ্যান করিয়া বা নিজ হৃদয়ের সুখ ও তৃপ্তি খুঁজিয়া এই দায়িত্বকে এড়াইয়া গেলে সমাজবন্ধনই শিথিল হইয়া পড়ে, বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমাজশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিমানসের সংঘর্ষ এই উপন্যাসের মধ্যে রূপ পাইয়াছে। সমাজশক্তির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের আভাসও শৈবলিনী-চরিত্রে আছে। এই দিক দিয়া শৈবলিনী-চরিত্র খুবই আধুনিক। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিদ্রোহ দেখাইয়াছেন, নির্য্যাতিত ব্যক্তিমানসের প্রতি সহানুভূতিও দেখাইয়াছেন, কিন্তু এই বিদ্রোহের মধ্যে তিনি কোনও মহত্তর কল্যাণ খুঁজিয়া পান নাই।

এইজন্যই শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। শৈবলিনী মরিল, এই কথা বলিয়া প্রতাপকে ছাড়িয়া শৈবলিনী পলায়ন করিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। প্রতাপের নিকট শেষ বারের মত প্রত্যাখ্যাত হইয়া, প্রতাপের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া, শৈবলিনীর জীবন নদীতে যে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ উঠিল—ইহাই তাহার মনে প্রথম প্রতিক্রিয়া। এত বড় একটা মানসিক পরিবর্ত্তন, শৈবলিনীর একটা নূতন জন্মলাভ, যাহার ফলে প্রতাপের প্রতি অনুরাগের মূল পর্য্যন্ত তাহার মন হইতে উৎপাটিত হইল, তাহার স্তর-পরম্পরা অর্থাৎ কিভাবে তাহার মন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে তাহার বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই। জড় প্রকৃতি কিভাবে শারীরিক দুঃখ যাতনার মধ্য দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের সূচনা করিয়া দিতেছে, তাহার উন্মত্ত চিন্তাধারা কিভাবে তাহার অন্তর্দাহকে নরকাগ্নি শিখায় জ্বালাইয়া তুলিতেছে, স্বামীর চিন্তা কিভাবে তাহার চিত্তে শান্তি আনিয়া দিতেছে, উপবাসে ও কৃচ্ছ্র সাধনে দেহচেতনাকে প্রায় লুপ্ত করিয়া দিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একই লক্ষ্যে অভিমুখী করিয়া কিভাবে শৈবলিনীর মনের সংস্কার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা বিস্মিত বিমূঢ় হইয়া আমরা পাঠ করি। প্রতাপের প্রতি অনুরাগ ভুলিতে গেলে, নিজের মনের গতি অন্য খাতে বহাইতে গেলে এ প্রচণ্ড অন্তর্দাহ, এই জীবন্ত নরক দর্শন একান্তই প্রয়োজন। এই আয়োজন না করিলে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রতাপের মত প্রণয়ীর প্রতি অনুরাগ ভুলিতে পারা যায় না। প্রায়শ্চিত্তের পরে শৈবলিনীর মানসিক বিকৃতির চিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনার বক্তব্য

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের পরিণতি সর্বান্তঃকরণে শিল্পসম্মত বলিয়া মানিয়া লওয়ার একটা দ্বিধা এবং গ্রন্থকারের উগ্র নীতিবোধের সমালোচনা অনেকেই আজকাল করিয়া থাকেন। এই বিরূপ সমালোচনার প্রকৃতিটি ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের বঙ্কিম মানস গ্রন্থে উপন্যাসটির আলোচনা প্রসঙ্গে চমৎকারভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। "রাজনৈতিক

পরিবর্তনের ঝড়ো হাওয়া, রাষ্ট্রলোলুপ জিঘাংসা, অসংযত চরিত্র ইংরাজ কর্মচারীর কামাতুর দৃষ্টি তাঁহার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, এবং পরিণামে শুধুমাত্র লেখকের স্থায়দণ্ড বিধির কল্যাণে চন্দ্রশেখর জীবনের স্থিতিশীল ভিত্তি পারিতোষিকস্বরূপ লাভ করিয়াছেন। * *

"এই ন্যায়দণ্ডবিধির পরিপ্রেক্ষণে স্রষ্টা শৈবলিনীকে একটা নৈতিক আদর্শ সংস্থাপনের দৃষ্টান্তস্বরূপই ব্যবহার করিয়াছেন। তাই তাহার জীবনের সংকট যতখানি বাহিরের অভিঘাতে, তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অন্তরের অনুতাপে, শৈবলিনী প্রতাপকে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু মুহূর্তের দুর্বলতায় সে প্রতাপের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও প্রতাপের প্রতি তাহার ভালবাসা কখনও ম্লান হয় নাই। চন্দ্রশেখরের সহিত তাহার বিবাহ প্রতাপের প্রতি তাহার প্রেমকে শিথিল না করিয়া আরও গাঢ় করিয়াছে। কেননা শৈবলিনীর প্রেমতৃষা চন্দ্রশেখর মিটাইতে সমর্থ হন নাই। এক্ষেত্রে মানবিক সম্পর্কের বিচারে শৈবলিনীর মানসিক বিদ্রোহের সঙ্গত কারণ বর্তমান রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিবাদ ও অধিকারতত্ত্ব সম্ভবত ইহা অস্বীকার করিত না। কিন্তু যুক্তিবাদের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণের কথা নয়। তাঁহার প্রাণের কথা, সনাতন নীতিধর্মের অনুশাসন দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা। শৈবলিনী ধর্মমতে চন্দ্রশেখরকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং তাহার প্রেমতৃষ্ণা চরিতার্থ না হইলেও বিবাহের পবিত্রতা তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, কায়মনোবাক্যে তাহাকে বিবাহ সম্পর্কের বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এমন কি মনে মনেও মুহূর্তেকের জন্য দ্বিচারিণী হইলে চলিবে না। কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপকে ও প্রতাপ শৈবলিনী সম্পর্ককে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। তাই সে দ্বিচারিণী, তাহার প্রেমতৃষ্ণা তাহাকে প্রতাপ-শৈবলিনী সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করার অনুপ্রেরণায় ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিক তত্ত্বানুযায়ী শৈবলিনী ধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত হয়; এই বিচ্যুতির কলুষ হইতে ধর্মাচরণের মহিমায় শৈবলিনী পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই তাহার প্রায়শ্চিত্ত এবং যৌগিক প্রথায় তাহার চিকিৎসা। ইহাতে মানবিক সম্পর্ক অতিক্রম করিয়া ধর্মসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"শৈবলিনী আত্মশুদ্ধিকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের বুদ্ধিসংকট চরমে পৌঁছায়। বঙ্কিমচন্দ্রও সমস্যাটিকে মন দিয়া দেখিয়াছেন, চোখ দিয়া দেখেন নাই। তাই এখানে তাঁহার বুদ্ধি পরাভূত, পূর্বসংস্কারই বিজয়ী। চন্দ্রশেখরকে পুরস্কৃত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখরের প্রেমের আকর্ষণে তিনি শৈবলিনীর রূপান্তর সাধন করিতে পারেন নাই। আধ্যাত্মিক যোগবলের প্রচারে তাহার

অনুরাগের মূল উৎস উৎপাটিত করিয়াছেন। রক্তমাংসের মানুষকে হত্যা করিয়া, তিনি কয়েকটি নৈতিক তত্ত্বকে শৈবলিনীর মধ্যে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন। তাই চন্দ্রশেখর রক্তমাংসের শৈবলিনীকে পুনর্বার লাভ করিয়াছেন কি অনুভূতিহীন ধর্মপুত্তলিকাকে পাইয়াছেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন শিল্পী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের এক্ষেত্রে পরাজয় হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্র নীতিবোধ এই প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিয়াছে এবং শিল্পী বঙ্কিমের পক্ষে এই নীতিবোধের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নাই, এইরূপ মত আধুনিক অনেক পাঠক-পাঠিকাই পোষণ করেন। নীতিবোধের জন্ম হইয়াছে সামাজিক কল্যাণবোধ হইতে এবং একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্ন এড়াইয়া চলিবে ইহা আমরা সমর্থন করি না, কিন্তু এই নীতি-বোধের সহিত সৌন্দর্য্য-বোধের বিরোধ বাধিয়াছে কিনা ইহাই এক্ষেত্রে বিচার্য্য। প্রবল অন্তর্দাহের মধ্য দিয়া শৈবলিনীকে নূতন জীবনে উত্তীর্ণ করা ও স্বামিগৃহে তাহাকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে এ প্রায়শ্চিত্ত নীতির নির্য্যাতন নয়।

শৈবলিনীর মানসিক রোগের চিকিৎসা ও তাহাকে অভিভূত করিয়া তাহার পাপের স্বরূপ, তাহার দৈহিক নিষ্পাপত্ব ও তাহার মনের প্রকৃত পরিচয় যেখানে আদায় করা হইতেছে, সেই অংশটিই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল অংশ। শৈবলিনী (ও দলনী) সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ও জেরা আমাদের মনে নূতন কোনও সংবাদ বহন করিয়া আনে না, নূতন কোনও চমক দিতে পারে না। অথচ লেখকেরও উপায়ও ছিল না। শৈবলিনী যখন সসম্মানে স্বামিগৃহে স্থান পাইবে তখন তাহার নিষ্পাপত্ব সম্বন্ধে সকলেরই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাবী করিবার অধিকার আছে। আর দলনীর সম্বন্ধে তকি খাঁর গল্প যে কত বড় মিথ্যা, তাহা শুনিয়া যাইবার প্রয়োজন পাঠকের না থাকিলেও নবাব মীর কাসেমের আছে।

কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে প্রতাপের মৃত্যুতে। শৈবলিনীকে প্রতাপ এত ভালবাসিত যে, শৈবলিনীর কথায় সামান্য একটু ইঙ্গিত পাইয়া সে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইবে তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। প্রতাপ-চরিত্রের প্রকাশ পাইয়াছে একেবারে শেষে। মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে—রমানন্দ স্বামীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া, সকলের চিত্ত শ্রদ্ধাবনত করিয়া প্রতাপের দেহত্যাগে উপন্যাসের উপসংহার করা হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর নামের সার্থকতা ও তাৎপর্য্য

চন্দ্রশেখর-চরিত্র

প্রতাপ-শৈবলিনীর অতুলনীয় প্রেমের দীপ্তি চন্দ্রশেখরকে বহুলাংশে নিষ্প্রভ করিয়া দিলেও চন্দ্রশেখরই গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ চরিত্র। চন্দ্রশেখর নবাব মীর কাসেমের গুরু আবার রমানন্দ স্বামীর শিষ্য। এই চন্দ্রশেখরের পত্নী বলিয়াই রমানন্দ স্বামী শৈবলিনীকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তাঁহার যোগবল প্রয়োগ করিয়াছেন। দুইটি কাহিনীর মধ্যে যে যোগ স্থাপিত হইয়াছে তাহাও চন্দ্রশেখরকে দিয়াই। চন্দ্রশেখর দলনী বেগমের আশ্রয়দাতা। সর্ব্বোপরি প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপের পর শৈবলিনী এই চন্দ্রশেখরের নিকটই ফিরিয়াছে। চন্দ্রশেখর নামটি সর্ব্বাংশেই সমীচীন হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদারের মন্তব্যটি স্মরণ করা যাইতে পারে। মন্তব্যের আলোকে শিল্পী বঙ্কিমকে নূতন করিয়া চিনিবার সহায়তা হইবে মনে করিয়া মন্তব্যটি বিস্তারিতভাবেই উদ্ধৃত করা গেল।

"যে দুই আদর্শের কথা বলিয়াছি 'চন্দ্রশেখরে' কবিমানসের সেই দুই আদর্শের দ্বন্দ্ব অতিশয় লক্ষণীয়। একদিকে হোমার, সেক্সপীয়ার—অপরদিকে ব্যাস, বাল্মীকি। একদিকে পুরুষের রাজসিক আত্মাভিমান, প্রতাপের সেই আত্মজয়ের দুর্দ্ধর্ষ বীরপনা; অপরদিকে সাত্ত্বিক আত্মস্থতার নিরভিমান মহত্ত্ব—চন্দ্রশেখরের কীর্তিহীন, বীরত্বহীন অবিক্ষুব্ধ পৌরুষ। এই দুই আদর্শের কোনটি মহত্তর, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা ঐ কাহিনীতে স্পষ্ট নির্দেশ করেন নাই, বরং শৈবলিনীর পতি নয়—প্রণয়ই নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং তাহাতে রোমান্সের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে; এ কাহিনীর যত কিছু কাব্যরস প্রতাপ ও শৈবলিনীকে ঘিরিয়া অতলস্পর্শী হইয়াছে। কিন্তু তবু উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে চন্দ্রশেখরের নামে। বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে কবি ও সমালোচক, সে সমালোচনা উৎকৃষ্ট সৃষ্টিশক্তির সহগামী; তাহারই রশ্মিপাতে কবির কল্পনা পথভ্রষ্ট হয় না। অতএব উপন্যাসের ঐ নামকরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। গ্রন্থমধ্যে তিনি পাঠকের বুদ্ধিভেদ করেন নাই—সম্ভবতঃ নিজের প্রবল গভীর কাব্যরসাবেশও তাহার জন্য দায়ী। অনন্তপ্রবাহিণী ভাগীরথী চন্দ্রকরোজ্জ্বল বারিরাশির মধ্যে প্রতাপ-শৈবলিনীর সেই সাঁতার সমগ্র কাব্যখানিকে ভাববন্যায় উচ্ছলিত করিয়াছে। তাই সেই কাব্যবন্যা হইতে দূরে, পল্লীর এক নিভৃত কুটীরে, মাটির প্রদীপে, যে একটি স্থির শিখা জ্বলিতেছে, সেদিকে তাকাইবার অবকাশ আমরা পাই না। তবু এই কাব্যের নাম 'চন্দ্রশেখর'। প্রতাপ পুরুষবীর, চন্দ্রশেখর জ্ঞানী, আত্মদর্শী। ঐ পুরুষবীর

নারীপ্রেমকে প্রত্যাখান করিয়াই তাহার পুরুষাভিমান চরিতার্থ করিল।*** কাব্য সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রতাপের উদ্দেশে একেবারে নিজের জবানীতেই যে মর্মবিদারক সান্ত্বনাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহাতে জীবনকে ও প্রকৃতিরূপা নারীকে একরূপ বর্জন করাই হয়; পুরুষের জীবনে একটা মহাশূন্যই মুখব্যাদন করিয়া থাকে।* * * শৈবলিনী ও প্রতাপের মধ্যে চিরবিচ্ছেদই অবশ্যম্ভাবী—নারীর ধর্ম ও পুরুষের ধর্ম এক নহে; একের যাহাতে নিঃশ্রেয়স, অপরের পক্ষে তাহা আত্মহত্যা মাত্র।* * *প্রতাপ ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছিল—তাহাতেও আত্মার আর্তনাদ স্তব্ধ হয় নাই। সেই আত্মাভিমানের বশে সে ঐ নারীকে এতটুকু মমতা করে নাই। শৈবলিনীর নারীজীবন ব্যর্থ, এমন কি নিঃশেষে নিহত হওয়ার পর প্রতাপের ঐ আত্মবিসর্জনে পুরুষের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে—শৈবলিনীর তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু আর একজনের দিকে চাহিয়া দেখ—সে স্থিতধী ও স্থিরপ্রজ্ঞ; তাহাকে প্রতাপের মত এমন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, এমন করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয় নাই। তাই বলিয়া তাহার হৃদয় ক্ষুদ্র নয়—নিস্তরঙ্গ বটে কিন্তু গভীর। শৈবলিনী তাহার বিবাহিতা স্ত্রী—তাহার অন্তরের কাহিনী তাহার আজন্মের সেই অপ্রতিবিধেয় নিয়তির কথা সে শুনিল; স্ত্রী অন্যপূর্বা, তাহাও স্ত্রীর মুখেই জানিল; তথাপি সে তাহাকে ত্যাগ করিল না—অনন্ত ক্ষমা ও অপরিসীম করুণায় সেই ঐ ভাগ্যহত, সমাজবিধিবিড়ম্বিত, সর্বআশাশূন্য বিদীর্ণকায়া নারীকে বুকে তুলিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল। প্রতাপ যখন ইন্দ্রিয় জয়ের বীরলোকে প্রয়াণ করিতেছে, তখন চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সেই জ্ঞানহীন ও ও প্রায় প্রাণহীন দেহটাকে যে কারণে পরিহার করিতে পারিল না—তাহা হৃদয়ের দুর্বলতা নয়। অসতী স্ত্রীর প্রতি আত্মমর্যাদাহীন স্বামীর হীন আসক্তি নয়; তাহা যে কি, সে কথা ঐ কাহিনীর মধ্যে উহ্য রাখিয়া কবি উপন্যাসের নামকরণে দৃঢ় নির্দেশ করিয়াছেন। উপন্যাসের নায়ক ঐ দুইজনেই—দুই আদর্শের; একজন নায়িকা নারীর প্রেমাস্পদ; সেই নারী নিষিদ্ধ প্রেমের অগ্নিবেষ্টনীতে আপনাকে বেড়িয়াছে, আর সেই পুরুষ তাহা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া, ভূমিতল হইতে ঊর্ধ্বে উঠিয়া আকাশে যোগাসন পাতিয়াছে। অপর জন—তেমন নায়কমহিমা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে পুরুষের নীরব জয়লাভ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ মহিমার একটি স্তব্ধ গভীর শান্ত স্থির মূর্তিরূপে সে আমাদের মুগ্ধদৃষ্টির অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে।"

শৈবলিনীর এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী কেবল শৈবলিনীর দুর্দম প্রকৃতিই নয়,

চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রহস্যময় প্রেম দেবতার লীলা প্রত্যেকেই কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছে। চন্দ্রশেখরের অংশটুকুই আলোচনা করা যাক। চন্দ্রশেখর কিছু পরিমাণে অধিক-বয়স্ক হইলেও সুপুরুষ, তত্ত্বজ্ঞ, পরোপকারী, শুভ্রচরিত্র—এক কথায় বলিতে গেলে একজন আদর্শ পুরুষ। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থপ্রীতি তাঁহার পত্নীপ্রেমের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিবাহের প্রেরণা যিনি অন্তরে অনুভব করেন নাই, গৃহকার্য্য সম্পাদনের জন্য মাতার মৃত্যুর পর বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করিয়াও যিনি সুন্দরী বিবাহ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাঁহাকেও অপ-রূপ সুন্দরী শৈবলিনীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। শাস্ত্রালোচনায় অনন্যচিত্ত এই দার্শনিক পণ্ডিতের পত্নীর প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় ছিল না। অথচ তাঁহার অন্তরে পত্নীপ্রেমের অভাবও ছিল না—অদৃশ্য ফল্গুধারার মত একটা নিস্তরঙ্গ স্নেহধারা তাঁহার অন্তরে প্রবাহিত ছিল তাহার পরিচয় আমরা বহু স্থলেই পাই। কিন্তু কোনখানেই সেই প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। তাহার পত্নীপ্রেমের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আবেগ থাকিলে হয়ত ঘটনার ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হইত। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেমের বন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই প্রেমের মধ্যে যদি প্রাণাবেগ না থাকে, প্রত্যহের স্বপ্ন-সুষমাময় মধুর আবেশে যদি তাহা নিত্য নবায়মান হইয়া না উঠে, তাহা হইলে স্বামীর প্রতি, সংসারের প্রতি আকর্ষণ থাকা সকল নারীর পক্ষে সকল সময় সম্ভবপর নাও হইতে পারে। স্বামীগৃহ সেই নারীর নিকট নিরানন্দ না হইলেও কতক পরিমাণে স্বাদহীন হইয়া পড়ে।

শৈবলিনীরও তাহাই হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে উচ্ছ্বসিত ধারায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইলে তাহা শৈবলিনীর অন্তর পরিপ্লাবিত করিয়া প্রতাপের প্রতি তাহার আশৈশব সঞ্চিত প্রেমের উপর হয়ত একটা বিস্মৃতির আবরণ আনিয়া দিত। কিন্তু চন্দ্রশেখর কতকটা তাঁহার গ্রন্থপ্রীতির জন্য, কতকটা বা তাঁহার বয়সের আধিক্যজনিত সংকোচবশতঃ তাঁহার প্রেমকে যেন একান্ত সংগোপনে পোষণ করিয়াছিলেন। ইহার ফল হইল এই, চন্দ্রশেখরের ঔদাসীন্য শৈবলিনীর অন্তরে প্রতাপের প্রতি সঞ্চিত প্রণয়-বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া বিশাল মহীরুহে পরিণত হইবার সুযোগ দিয়াছে। শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর জ্ঞানচর্চ্চার সঙ্গিনী বা শিষ্যা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। শান্ত পল্লীর ক্ষুদ্র এক গৃহস্থালীর কাজ সমাধা করিয়া শৈবলিনী যে দীর্ঘ অবসর পাইত সেই অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভরিয়া উঠিত প্রতাপের ধ্যানে বা চিন্তায়। সন্তানহীনা হওয়ায় শৈবলিনীর সেই একলক্ষ্যী প্রেমী

অপর কোনো প্রিয়বস্তু খুঁজিয়া পায় নাই। চন্দ্রশেখরের প্রকৃতি এই কাহিনীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হইলেও পরোক্ষভাবে বহুলাংশে দায়ী।

শৈবলিনী চরিত্র

এই উপন্যাসে একমাত্র শৈবলিনী চরিত্রই বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অপর চরিত্রগুলির মধ্যে জটিলতার অবকাশ নাই—অন্ততপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র রাখেন নাই।

শৈবলিনীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই তাহার হৃদয়ে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের প্রতি প্রেমের আবির্ভাব, তাহার হৃদয় দৌর্ব্বল্য, প্রতাপকে লাভ করিবার কামনা ও সেই প্রসঙ্গে তাহার চূড়ান্ত দুঃসাহসিকতা ও বুদ্ধি এই বিদ্রোহিনী নারীকে একটা রহস্যময় দীপ্তি দান করিয়াছে। শৈবলিনীর রূপের তুলনা নাই; মতিবিবির মত বাক্‌বৈদগ্ধ্য না থাকিলেও শৈবলিনী প্রগল্‌ভা, পরিহাস-নিপুণা। শৈবলিনীকে দেখিয়া লরেন্স ফষ্টরেরও সন্দেহ জাগিয়াছে—তুষারময়ী মেরী কি এই উষ্ণদেশের শিখারূপিনী সুন্দরীর তুল্য? ফষ্টর রূপোন্মত্ত কামুক, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও চন্দ্রশেখরের মত ভোগসুখমুক্ত মনকেও শৈবলিনী মুগ্ধ করিয়াছে, সন্ন্যাসীকেও সংসারের মায়ায় আবদ্ধ করিয়াছে। এই রহস্যময়ীর অন্তরে এমন একটা প্রবল প্রতিরোধ শক্তি ছিল, এমন একটা দুর্ভেদ্য কঠিনতা ছিল যে, দুরন্ত ইংরেজ যুবককেও সে ছুরি দেখাইয়া বশ করিয়াছে, ইংরেজের নৌকায় সে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়াছে। শৈবলিনীর চরিত্রে একটা দুঃসাহসিকতা ছিল যাহার ফলে অবলীলা-ক্রমে নবাবের সম্মুখে সে প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া নিজের পরিচয় দিল, ও লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র ও নৌকা চাহিয়া লইয়া বন্দী প্রতাপের উদ্ধার সাধনে ধাবিত হইল। মসীবুদ্দিন খোজা সত্যই বলিয়াছে—এ দোসরা চাঁদসুলতানা। শৈবলিনী বিদ্রোহিনী, সংসারের কোন আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া রাখিতে পারিল না, প্রতাপের প্রেম, তাহাকে লাভ করিবার আশা তাহাকে পাগল করিয়া দিল। সে অসম্ভবের আশায় গৃহত্যাগ করিল। উদ্ধার পাইয়া যখন সে প্রতাপের বাসায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহার তখনকার কথাবার্ত্তা তীব্র অনুভূতিময় ও নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ। তাহার প্রেমের প্রাবল্য, অনুভূতির তীব্রতা, অন্তরের জ্বালা এই কথাগুলির মধ্য দিয়া যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। প্রতাপকে উদ্ধার করিবার সমস্ত ফন্দীটাই সে নিজে উদ্ভাবন করিয়াছে ও পাগলিনী সাজিয়া প্রতাপের উদ্ধারের পথ প্রস্তুত করিয়া দিবার সবখানি কৃতিত্বই তাহার। যে প্রতাপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া তাহার এতদিন কাটিল, যে প্রতাপকে লাভ করিবার দুর্ব্বার আগ্রহে সে বিঘ্নবিপদ তুচ্ছ করিয়া অসাধ্য সাধন

করিল, সেই প্রতাপের সংস্পর্শে আসিয়া, প্রতাপের পুণ্যপ্রভাবে পড়িয়া শৈবলিনীর জীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নিজের ভোগ-সুখ, কামনা-বাসনার যে অঞ্জন তাহার চোখে এতকাল লাগিয়াছিল তাহা গঙ্গার জলে ধুইয়া গেল—শৈবলিনী প্রতাপকে প্রতিশ্রুতি দিয়া তীরে উঠিল, তারপর অদৃশ্য হইল। তাহার মানস ব্যভিচার ও স্বামীগৃহ ত্যাগ এই অপরাধের জন্য তাহার মনে অনুতাপের আগুন জ্বলিল। দীনা, মলিনা, অশ্রুমুখী শৈবলিনীর আর এক মূর্ত্তি দেখা গেল। রোগমুক্তির পর সে প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতেছে—'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানিনা।' শেষ মুহূর্ত্তে বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীর মুখে এই কথাটি দিয়া শৈবলিনী চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াছেন, এই কথাটি না থাকিলে শৈবলিনী চরিত্রের উপসংহার অস্বাভাবিক হইত সন্দেহ নাই।

বিদ্রোহিনী নারীর চরিত্রে যে সারল্য ও তেজস্বিতা থাকে, তাহা শৈবলিনীর ছিল। পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর দুর্ব্বার গতিবেগের সঙ্গেই কেবল তাহার অন্তর প্রকৃতির তুলনা হয়। গ্রন্থকারের নামকরণ সার্থক।

প্রতাপ

শৈবলিনীর প্রতি নিবিড় প্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রতাপকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। স্বজাতির ভীরু অপবাদ ঘুচাইবার জন্য, বাঙ্গালীর সম্মুখে কেবল দৈহিক শৌর্য্য বীর্য্য সাহসে নয়, যথার্থ চিত্তবলে বলী এক মহাবীরের চরিত্র উপস্থাপিত করিবার জন্য বঙ্কিম প্রতাপের চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি অনেকখানিই লেখককে করিতে হইয়াছে প্রতাপের জন্য। গ্রন্থারম্ভে দেখিতে পাই শৈবলিনীর কথায় সে গঙ্গাবক্ষে ডুবিয়াছে। গ্রন্থশেষে শৈবলিনীর কথায় সে যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ছুটিয়া গিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে।

চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহের পর হইতে সে তাহার এই প্রেমের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। তাহার কর্ম্মধারা পরোক্ষভাবে শৈবলিনীর প্রতি একান্ত প্রেমের সাক্ষ্য দেয় বটে কিন্তু তাহার ভাবণে তাহার হৃদয় ভাবের সামান্যতম ইঙ্গিতও নাই। মৃত্যুকালে একবার মাত্র রমানন্দ স্বামীর সম্মুখে বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রতাপ তাহার আজন্মলক্ষিত নিরুদ্ধ আবেগকে প্রকাশ করিয়াছে। এই গভীর প্রেমের সহিত এই অসাধারণ চিত্তসংযম সংযুক্ত হইয়া প্রতাপ চরিত্রের উপর

এক স্বর্গীয় দীপ্তি বিস্তার করিয়াছে। মধ্যযুগের ইওরোপের শিভালরি যেন এই বাঙালী বীরের চরিত্রে জীবন্ত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে। গ্রন্থশেষে রমানন্দ স্বামী ও গ্রন্থকার স্বয়ং প্রতাপ চরিত্রের যে প্রশংসা গান করিয়াছেন এই গ্রন্থ পাঠ শেষ করিবার সময় পাঠক-পাঠিকাগণও তাহার সঙ্গে আপন কণ্ঠ মিলাইবেন।

মীর কাসেম চরিত্র

মীর কাসেম উপন্যাসের গৌণ আখ্যায়িকার নায়ক এবং বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব। সুতরাং নবাব মীর কাসেমের চরিত্রে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অতি-রিক্ত একটি রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও দায়িত্ব রহিয়াছে। যে ইংরাজ ছলে বলে কৌশলে সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার করায়ত্ত করিতে চাহিতেছে তিনি তাহাদের বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "ইংরাজেরা যে আচরণ করিতেছেন তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমাদের উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব। অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সিরাজদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি।" এই একটি কথায় নবাব মীর কাসেমের সমস্ত চরিত্রটি একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। আমরা বুঝিতে পারি তাঁহার এই রাজো-চিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; তাঁহাকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছে। নিজের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা করিলে তিনি ইংরাজের সহিত মিতালি করিয়া ইংরাজের খেলার পুতুল হইয়া নির্ব্বিবাদে নবাবী করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নামে নবাব থাকিতে চাহেন নাই, কার্য্যতঃ রাষ্ট্রপরিচালনার ভার নিজ হাতে গ্রহণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন। মীর কাসেম চরিত্রে যে রাজনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে তাহা ইতিহাসের একান্ত অনুগত। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বোধের প্রকৃষ্ট পরিচয়।

তবু মীর কাসেম চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের পরাজয়কেও ম্লান ও গৌণ করিয়া দিয়াছে। দলনী বেগমের প্রতি গভীর অনুরাগ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের মূল সুর। দুর্ভাগ্য যখন দলনীকে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল তখন তিনি তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য চেষ্টার ক্রটি

করেন নাই। মহম্মদ তকি প্রদত্ত মিথ্যা সংবাদ নবাবের শান্ত সংযত চিত্তকেও উদভ্রান্ত করিয়া তুলিল। "ইংরাজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে, সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে, রাজলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী।" তিনি দলনীকে বিষপান করাইবার আদেশ দিলেন। পরে যখন কুলসমের নিকট সকল কথা শুনিলেন তখন তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। তাঁহার সকল সাধ আশা ফুরাইল। নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড যে ছিন্ন করিয়াছে তাহার সান্ত্বনা কোথায়? নবাব ভূলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এ সংসারে নবাবী এইরূপ। রাজোচিত কঠোরতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত এই পরম আর্ত্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট এই মীর কাসেম চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্যের অন্যতম পরিচায়ক।

দলনী চরিত্র

স্বামী-প্রেমই দলনী চরিত্রের প্রধানতম উপাদান। প্রেমই নারীর একমাত্র জগৎ এই যে কবির উক্তি দলনী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামীর প্রতি একান্ত ভালো-বাসাই তাহাকে দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বামীর সহিত সত্বর পুনর্মিলনের দুরন্ত আশাই তাহাকে লরেন্স ফষ্টরের নৌকা ত্যাগ করিবার মত মূঢ়তাকে এবং রমানন্দ স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ যাত্রার মত অবিবেচনাকে প্রশ্রয় দিয়াছিল। অবশেষে ভ্রান্ত নবাবের নিকট হইতে যখন বিষ পানের আদেশ আসিল মহম্মদ তকির সকল হীন প্রলোভনকে অবজ্ঞা করিয়া স্বামীর নির্দ্দেশ পালন করিবার জন্য তখন দলনী অবিচলিত হৃদয়ে বিষপান করিল। এ নির্দ্দেশ যে তাহার প্রিয়তমের নির্দ্দেশ। তাহার এই অপার্থিব প্রেম দিয়াই দলনী মৃত্যুকে সুন্দর বরণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সুদূর ইস্পাহান হইতে ভাগ্যান্বেষণে যে বালিকা বাংলায় আসিয়া অদৃষ্টক্রমে নবাবের অন্তঃপুরে স্থান পাইল, ভাগ্যগুণে যে নবাবের প্রধানা মহিষীর গৌরব অর্জ্জন করিল, দুর্ভাগ্য যে তাহার সহিত এই নিষ্ঠুর পরিহাস করিবে তাহা কে বলিতে পারে! বিচার বিশ্লেষণে এই অতুলনীয় প্রেমের গভীরতার পরিমাপ করা যায় না, এই প্রগাঢ় প্রেমরসের বর্ণ-গন্ধ ও স্বাদের আভাসই আমাদের নিকট চরম প্রাপ্তি বলিয়া মনে হয়।

উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র অপ্রধানগুলিকে লেখনীর দু-একটি আঁচড়ে একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। শৈবলিনীর সহচরী সুন্দরী আর দলনীর সহচরী কুলসম অনেকটা একই ধাতের। আমিয়ট, গলষ্টন, জনসন প্রভৃতি ইংরেজ চরিত্রও যেন একসুরে বাঁধা। স্বার্থের খাতিরে সর্ব্বপ্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ, আবার প্রয়োজন হইলে অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন তাহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। কামুকতা ও চরিত্র দৌর্ব্বল্য লরেন্স ফষ্টর চরিত্রে কিছু পরিমাণ বিশিষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। শেষের দিকে নিজের মনের পাপ অভিসন্ধি প্রকাশ করার পর ফষ্টর ইংরেজ-সুলভ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছে।

রামচরণের ধূর্ত্ততা ও প্রভুভক্তি, গুর্গণ খাঁর স্বার্থপরায়ণতা, মহম্মদ তকির বিশ্বাসঘাতকতা, করিমন বিবির লোভ এবং বকাউল্লার প্রতিশোধ স্পৃহা এত স্পষ্ট যে তাহা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। অথচ কাহিনীর মোড় ফিরাইয়া দিবার জন্য এই কয়েকটি চরিত্রের দায়িত্ব বড় কম নয়। তুচ্ছ ঘটনা বা ক্ষুদ্র চরিত্রের সাহায্য লইয়া কাহিনীর মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করায় একটা গঠন-রীতিগত কৃতিত্ব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম বোধ ঘটনাজাল-বয়নে এই অপ্রধান চরিত্রগুলিকে কাজে লাগাইয়াছে।

চন্দ্রশেখর উদ্দেশ্যমূলক কি না ?

চন্দ্রশেখর উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলক কি না ? ইহার মধ্য দিয়া লেখক কি নীতি প্রচার করিতে চাহিতেছেন ? গল্পরস পরিবেশন করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যেক সচেতন শিল্পীর একটা জীবনদর্শন থাকে, বিশেষ পরিবেশের মধ্য দিয়া, বিচিত্র চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর একটা ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠে। গল্প যখন শেষ হইয়া যায়, তখনও জীবন ও জীবনের কঠিন সমস্যাগুলিকে দেখিবার বিশেষ ভঙ্গীটি পাঠকের চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করিতে থাকে। এই দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে একটি অভিশপ্ত বাল্য-প্রণয়ের কাহিনী বিচিত্র ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক পরিবেশের মধ্য দিয়া লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গল্পরসের অতিরিক্ত

কোনও শিক্ষা ও নীতি যিনি গ্রহণ করিতে চান তিনি বুঝিবেন, ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য জয় আর নাই, একজনের পতনেই দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় না, নিজের দুর্ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া যে সংসারের কর্ত্তব্যের মধ্যে আত্মনিয়োগ না করিয়া নিজের কামনা-বাসনাকে একমাত্র বড় করিয়া দেখে, সে কেবল নিজের দুর্গতিই বৃদ্ধি করে না, চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া দেয়।

প্রতাপের সহস্র স্মৃতিবিজড়িত জীবনে শৈবলিনী আর শান্তি পাইবে কি? জীবনের সমস্ত সুখ বিস্বাদ করিয়া দিয়া শৈবলিনীর উদাস দৃষ্টির সম্মুখে প্রতাপের যে চিতা অনির্ব্বাণ জ্বলিতে থাকিবে, তাহার আগুন নিভিবে কোন্ মন্ত্রবলে?

কলিকাতা
১২ই আষাঢ়, ১৩৬৬

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালক-বালিকা

ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ, নদী, বৃক্ষ দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ—বালিকার নাম শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূল-বিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর-তর রব সে ব্যঙ্গসঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে, তদ্বৎসুকুমার বন্যকুসুম চয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া, বালকের গলায় পরাইল, আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে; নিকটে হৃষ্টা-পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। কখন বা মালার বিনিময়ে বালক, নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময় সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ এটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গণ। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বল, দেখি? ষোলখানা? বাজি রাখ—আঠারখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর একবার গণিয়া একুশখানা হইল। তারপর গণনা ছাড়িয়া উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোণা জ্বলিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিল বা কে, উঠিল বা কে

এইরূপে ভালবাসা জন্মিল। প্রণয় বলিতে হয় বল, না বলিতে হয়, না বল। ষোল বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের স্থায় কেহ ভালবাসিতে জানে না।

(বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।) যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা-সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্দ্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর!

বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর—উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহার পথের ধারে, অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কাল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। (শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা।) সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

(শৈবলিনী দরিদ্রের কন্যা।) কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর—আর শৈবলিনীর রূপরাশি। (প্রতাপও দরিদ্র।)

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল—সৌন্দর্য্যের ষোলকলা পূরিতে লাগিল—কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুইজন পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ করিল। গোপনে গোপনে পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল—"আয় শৈবলিনী! সাঁতার দিই।" দুইজনেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে

দুইজনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলেই পারিত না। বর্ষাকাল —কূলে কূলে গঙ্গার জল—জল দুলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। ফেনচক্রমধ্যে সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয় রজতাঙ্গুরীয়মধ্যে রত্ন যুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল। সাঁতার দিতে দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া ঘাটে যাহারা ছিল তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না —চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—গালি দিল—দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূরে গিয়া প্রতাপ বলিল—"শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন, এইখানেই।" প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেই সময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না—ফিরিল। সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্সী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িল না, চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সেদিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইলেন না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন।—দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই।

দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্তই নিরুৎসাহ ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমতঃ, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়; অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, দেবসেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়—দেবতার সেবার সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু চন্দ্রশেখর স্থির করিলেন, যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না। কেন না, সুন্দরীর দ্বারা মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা। সংসারবন্ধনে মুগ্ধ হওয়া হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?

এই বিবাহের আট বৎসরের পরে এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

চন্দ্রশেখর

পাপীয়সী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে একস্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই। প্রকোষ্ঠমধ্যে সুরঞ্জিত হর্ম্ম্যতলে সুকোমল গালিচা পাতা। রজত-দীপে গন্ধতৈলে জ্বালিত আলোক জ্বলিতেছে। সুগন্ধ কুসুমদামের ঘ্রাণে গৃহ পরিপূরিত হইয়াছে। কিঙ্খাবের বালিসে একটি ক্ষুদ্র মস্তক বিন্যস্ত করিয়া একটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকাকৃতি যুবতী শয়ন করিয়া গুলেস্তাঁ পড়িবার জন্য যত্ন পাইতেছে। যুবতী সপ্তদশবর্ষীয়া, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি, বালিকার ন্যায় সুকুমার। গুলেস্তাঁ পড়িতেছে, এক একবার উঠিয়া চাহিয়া দেখিতেছে এবং আপন মনে কতই কি বলিতেছে। কখনও বলিতেছে, "এখনও এলেন না কেন?" আবার বলিতেছে, "কেন আসিবেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসীমাত্র, আমার জন্য এতদূর আসিবেন কেন?" বালিকা আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল।

আবার অল্পদূর পড়িয়াই বলিল, "ভাল লাগে না। ভাল, নাই আসুন, আমাকে স্মরণ করিলেই ত আমি যাই, তা আমাকে মনে পড়িবে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে একজন বৈ ত নই।" আবার গুলেস্তাঁ পড়িতে আরম্ভ করিল, আবার পুস্তক ফেলিল, বলিল, "ভাল, ঈশ্বর কেন এমন করেন? একজন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে পড়িয়া থাকে? যদি তাই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকেই চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হইয়া শালবৃক্ষে উঠিতে চাই কেন?" তখন যুবতী পুস্তক ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিল। নির্দ্দোষ-গঠন ক্ষুদ্র মস্তকে লম্বিত ভুজঙ্গরাশিতুল্য নিবিড় কুঞ্চিত কেশভার দুলিল—স্বর্ণ-খচিত সুগন্ধবিকীর্ণকারী উজ্জ্বল উত্তরীয় দুলিল—তাহার অঙ্গসঞ্চালনমাত্র গৃহমধ্যে যেন রূপের তরঙ্গ উঠিল। অগাধ সলিলে যেমন চাঞ্চল্যমাত্রে তরঙ্গ উঠে, তেমনি তরঙ্গ উঠিল।

তখন সুন্দরী এক ক্ষুদ্র বীণা লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল এবং ধীরে ধীরে, অতি মৃদুস্বরে গীত আরম্ভ করিল—যেন শ্রোতার ভয়ে ভীত হইয়া গাহিতেছে। এমন সময়ে নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাহার কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল। বালিকা চমকিয়া উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গাহিতেছিলে?" যুবতীর নাম বোধ হয়, দৌলত উন্নিসা, নবাব তাহাকে সংক্ষেপার্থ 'দলনী' বলিতেন। এজন্য পৌরজন সকলেই "দলনী বেগম" বা "দলনী বিবি" বলিত।

দলনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিল। দলনীর দুর্ভাগ্যক্রমে নবাব বলিলেন, "তুমি যাহা গাহিতেছিলে, গাও, আমি শুনিব।"

তখন মহা গোলযোগ বাধিল। তখন বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না। বীণা ফেলিয়া দলনী বেহালা লইল, বেহালাও বেসুরা বলিতে লাগিল, বোধ হইল। নবাব বলিলেন, "হইয়াছে, তুমি উহার সঙ্গে গাও।" তাহাতে দলনীর মনে হইল যেন নবাব মনে করিয়াছেন, দলনীর সুরবোধ হয় নাই। তারপর—তারপর দলনীর মুখও ফুটিল না! দলনী মুখ ফুটাইতে কত চেষ্টা করিল, কিছুতেই মুখ কথা শুনিল না—কিছুতেই ফুটিল না! মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না। মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্থলকমলিনীর ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। ভীরু কবির কবিতা-কুসুমের ন্যায়, মুখ যেন ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না। মানিনী স্ত্রীলোকের মানকালীন কণ্ঠাগত প্রণয়-সম্বোধনের ন্যায়, ফোটে ফোটে, তবু ফোটে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতার ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি কি সে সকল কথা শুন নাই?"

"শুনিয়াছি" বলিয়া দলনী নীরব রহিল। মীর কাসেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "দলনী বিবি, অন্যমনা হইয়া কি ভাবিতেছ?"

দলনী বলিল, "আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন? —আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা আমার বলা নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলিবার একটি অধিকার আছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ভালবাসেন।"

নবাব বলিলেন, "সে কথা সত্য দলনী,—আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে যেমন ভালবাসি আমি কখনও স্ত্রীজাতিকে এরূপ ভালবাসি নাই বা বাসিব বলিয়া মনে করি নাই।"

দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল। দলনী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চক্ষে জল পড়িল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল,—"যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হইবে, সেই হারিবে, তবে কেন তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন?"

মীর কাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। তুমি নিতান্তই আমার, এইজন্য তোমার সাক্ষাতে বলিতেছি—আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয় ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাজ-উদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি।"

দলনী মনে মনে বাঙ্গালার অধীশ্বরের শত শত প্রশংসা করিল। বলিল— "প্রাণেশ্বর! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমি কি বলিব? কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীর-কা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে? না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি ?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ?"

"কেন, তুমি যুদ্ধ করবে না কি ? বল, গুরগন্ খাঁকে বরতরফ করিয়া তোমায় বাহাল করি ?"

দলনী আবার অপ্রতিভ হইল, কথা কহিতে পারিল না। মীর কাসেম তখন সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন যাইতে চাও ?"

"আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া।" মীর কাসেম অস্বীকৃত হইলেন। কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "জাঁহাপনা, আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব ?"

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "তবে কলমদান দাও।"

দলনীর আজ্ঞাক্রমে পরিচারিকা স্বর্ণ-নির্ম্মিত কলমদান আনিয়া দিল।

মীর কাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ পরে, কাগজ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, বিমর্ষ হইয়া বসিলেন। দলনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলেন ?"

মীর কাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া মীর মুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদে একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে পরওয়ানা দাও যে, মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে যে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে দলনী বেগম কোথায় থাকিবে ?"

মীর মুন্সী তাহাই করিল। চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক পাঠাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কাল জলে পড়িয়াছে ; কাল জলে রৌদ্রের সঙ্গে

তালগাছের কাল ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। একটি ঘাটের পাশে কয়েকটি লতামণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ লতায় লতায় একত্র গ্রথিত হইয়া, জল পর্য্যন্ত শাখা লম্বিত করিয়া দিয়া, জলবিহারিণী কুলকামিনীগণকে আবৃত করিয়া রাখিত। সেই আবৃত অল্পান্ধকারমধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসীহস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

যুবতীর সঙ্গে জলের ক্রীড়া কি? তাহা আমরা বুঝি না; আমরা জল নহি। যিনি কখন রূপ দেখিয়া গলিয়া জল হইয়াছেন, তিনি বলিতে পারিবেন। তিনি বলিতে পারেন, কেমন করিয়া জল কলসীতাড়নে তরঙ্গ তুলিয়া বাহুবিলম্বিত অলঙ্কার-শিঞ্জিতের তালে তালে নাচে। হৃদয়োপরি গ্রথিত জলপুষ্পের মালা দোলাইয়া সেই তালে তালে নাচে। সন্তরণ-কুতূহলী ক্ষুদ্র বিহঙ্গমটিকে দোলাইয়া, সেই তালে তালে নাচে। যুবতীকে বেড়িয়া বেড়িয়া তাহার বাহুতে, কণ্ঠে, স্কন্ধে, হৃদয়ে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া, জলতরঙ্গ তুলিয়া, তালে তালে নাচে। আবার যুবতী কেমন কলসী ভাসাইয়া দিয়া, মৃদু বায়ুর হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া, চিবুক পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া বিম্বাধরে জল স্পৃষ্ট করে; বক্ত্র মধ্যে তাহাকে প্রেরণ করে, সূর্য্যাভিমুখে প্রতিপ্রেরণ করে, জল পতন-কালে বিম্বে বিম্বে শত সূর্য্য ধারণ করিয়া যুবতীকে উপহার দেয়। যুবতীর হস্ত পদ-সঞ্চালনে জল ফোয়ারা কাটিয়া নাচিয়া উঠে, জলেরও হিল্লোলে যুবতীর হৃদয় নৃত্য করে। দুই-ই সমান। জল চঞ্চল, এই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনীদিগের হৃদয়ও চঞ্চল। জলে দাগ বসে না, যুবতীর হৃদয়ে বসে কি?

পুষ্করিণীর শ্যামলজলে স্বর্ণ-রৌদ্র ক্রমে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে দেখিতে সব শ্যাম হইল—কেবল তালগাছের অগ্রভাগ স্বর্ণপতাকার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ী যাই।"

শৈবলিনী। কেহ নাই, ভাই, চুপি চুপি একটি গান গা না।

সু। দূর হ! পাপ! ঘরে চ!

শৈ। ঘরে যাব না লো সই!
আমার মদনমোহন আসছে ওই!
হায়! যাব না লো সই!

সু। মরণ আর কি! মদনমোহন ত ঘরে বোসে সেইখানে চল না।

শৈ। তাঁরে বল গিয়া, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে।

সু। নে, এখন রঙ্গ রাখ। রাত হলো—আমি দাঁড়াইতে পারি না। আবার আজ ক্ষেমীর মা বলছিল, এ দিকে একটা গোরা এসেছে।

শৈ। তাতে তোমার আমার ভয় কি?

সু। আ মলো, তুই বলিস্ কি? ওঠ, নহিলে আমি চলিলাম।

শৈ। আমি উঠ্‌বো না—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্য সত্য তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিল না। অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে সুন্দরী দেখিল, পুষ্করিণীর অপর পারে এক তালবৃক্ষতলে, সর্ব্বনাশ! সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। পিত্তল-কলস গড়াইতে গড়াইতে ঢক্ ঢক্ শব্দে উদরস্থ জল উদ্গীর্ণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাপী জলমধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না। কেবল বক্ষ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমজ্জন করিয়া, আর্দ্রবসনে কবরীসমেত মস্তকের অগ্রভাগমাত্র আবৃত করিয়া, প্রফুল্ল-রাজীববৎ জলমধ্যে বসিয়া রহিল। মেঘমধ্যে অচলা সৌদামিনী হাসিল—ভীমার সেই শ্যামতরঙ্গে এই স্বর্ণকমল ফুটিল।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে ধীরে তালগাছের অন্তরালে অন্তরালে থাকিয়া ঘাটের নিকটে আসিল।

ইংরেজ দেখিতে অল্পবয়স্ক বটে। গুম্ফ বা শ্মশ্রু কিছুই ছিল না। কেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুও ইংরেজের পক্ষে কৃষ্ণাভ। পরিচ্ছদের বড় জাঁকজমক এবং চেন, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কারের কিছু পারিপাট্য ছিল।

ইংরেজ ধীরে ধীরে ঘাটে আসিয়া জলের নিকট আসিয়া বলিল, "I come again fair lady."

শৈবলিনী বলিল, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

ইংরেজ। Oh—ay—that gibberish—I must speak it, I suppose. হম্ again আয়া হ্যায়।

শৈ। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ না বুঝিতে পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়।"

শৈ। যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম। John you mean হম্ জন্ নহি, হম্ লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম—লরেন্স অর্থে বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। লরেন্স ফষ্টর পুষ্করিণীর পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া আম্রবৃক্ষ-তল হইতে অশ্ব মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক টিবিয়ট নদীর তীরস্থ পর্ব্বত-প্রতিধ্বনি সহিত শ্রুতগীতি স্মরণ করিতে করিতে চলিলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল, "সেই শীতল দেশের তুষাররাশির সদৃশ যে মেরি ফষ্টরের প্রণয়ে বাল্যকালে অভিভূত হইয়াছিলাম, এখন সে স্বপ্নের মত; দেশভেদে কি রুচিভেদ জন্মে? তুষারময়ী মেরি কি শিখারূপিণী উষ্ণদেশের সুন্দরীর তুলনীয়া? বলিতে পারি না।"

ফষ্টর চলিয়া গেলে, শৈবলিনী ধীরে ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া কুম্ভকক্ষে বসন্তপবনারূঢ় মেঘবৎ গৃহে মন্দপদে প্রত্যাগমন করিল। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিল।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া নামাবলীতে কটিদেশের সহিত উভয় জানু বন্ধন করিয়া, মৃৎপ্রদীপ সম্মুখে তুলটে হাতে লেখা পুতি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর একশত বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত—তদুপরি চন্দন-রেখা। শৈবলিনী গৃহ-প্রবেশকালে মনে মনে ভাবিতেছিলেন, 'যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব?' কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না। তখন তিনি ব্রহ্মসূত্রের সূত্রবিশেষের অর্থ-সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

তখন চন্দ্রশেখর চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আজি এত অসময়ে বিদ্যুৎ কেন?"

শৈবলিনী বলিল, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে!"

চন্দ্র। কেন বকিব?

শৈ। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে তাই।

চন্দ্র। বটেও ত—এখন এলে না কি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা সুন্দরী ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না।" এই বলিয়া আবার শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব ইত্যাদি তর্কে নিবিষ্ট। শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্নব্যঞ্জন তাঁহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া, পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি বিদ্যালোচনা করিতেন, অল্পরাত্রে আহার করিয়া শয়ন করিতে পারিতেন না।

সহসা সৌধোপরি হইতে পেচকের গম্ভীর কণ্ঠ শ্রুত হইল। তখন চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া পুতি বাঁধিলেন। সে সকল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া আলস্যবশতঃ দণ্ডায়মান হইলেন। মুক্ত বাতায়ন-পথে কৌমুদী-প্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়ন-পথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্ত সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্লচিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি বিস্ফারিত-নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, চিত্রিত ধনুঃখণ্ডবৎ নিবিড়কৃষ্ণ ভ্রূযুগতলে, মুদিত পদ্মকোরক সদৃশ, লোচন-পদ্ম দুটি মুদিয়া রহিয়াছে;—সেই প্রশস্ত নয়নপল্লবে, সুকোমল সমগামিনী রেখা দেখিলেন। দেখিলেন, ক্ষুদ্র কোমল করপল্লব নিদ্রাবেশে কপোলে ন্যস্ত হইয়াছে—যেন কুসুমরাশির উপরে কে কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। মুখমণ্ডলে করসংস্থাপনের কারণে, সুকুমার রসপূর্ণ তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর ঈষদ্‌ভিন্ন করিয়া, মুক্তা সদৃশ দন্তশ্রেণী কিঞ্চিন্মাত্র দেখা দিতেছে। একবার যেন, কি সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া সুপ্তা শৈবলিনী ঈষৎ হাসিল—যেন একবার, জ্যোৎস্নার উপর বিদ্যুৎ হইল। আবার সেই মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ সুষুপ্তিসুস্থির হইল। সেই বিলাস-চাঞ্চল্য-শূন্য, সুষুপ্তিসুস্থির বিংশতিবর্ষীয়া যুবতীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল বহিল।

চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর সুষুপ্তিসুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া অশ্রুমোচন করিলেন। ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম

রাজমুকুটে শোভা পাইত। শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া এমন নব যুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ—সেইজন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি জন্মের সারভূত করিব, ছি ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর আহার করিতে ভুলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠী ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর বা কুঠীয়াল। লরেন্স অল্প বয়সে মেরি ফষ্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী স্বীকার করিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। এখানকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাঙ্গালার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফষ্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল। একদা তিনি প্রয়োজনবশতঃ বেদগ্রামে গিয়াছিলেন—ভীমা পুষ্করিণীর জলে প্রফুল্ল পদ্মস্বরূপা শৈবলিনী তাঁহার নয়নপথে পড়িল। শৈবলিনী গোরা দেখিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু ফষ্টর ভাবিতে ভাবিতে কুঠীতে ফিরিয়া গেলেন। ফষ্টর ভাবিয়া ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কটা চক্ষু অপেক্ষা কাল চক্ষু ভাল এবং কটা চুলের অপেক্ষা কাল চুল ভাল। অকস্মাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, সংসারসমুদ্রে

স্ত্রীলোক তরণীস্বরূপ—সকলেরই সে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য—যে সকল ইংরেজ এ দেশে আসিয়া পুরোহিতকে ফাঁকি দিয়া বাঙ্গালী সুন্দরীকে এ সংসারে সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা মন্দ করেন না। অনেক বাঙ্গালীর মেয়ে ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে—শৈবলিনী কি ভজিবে না? ফষ্টর কুঠীর কারকুনকে সঙ্গে করিয়া আবার বেদগ্রামে আসিয়া বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। কারকুন শৈবলিনীকে দেখিল—তাহার গৃহ দেখিয়া আসিল।

বাঙ্গালীর ছেলে মাত্রেই জুজু নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখিতে চাহে। শৈবলিনীর সেই দশা ঘটিল। শৈবলিনী প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্য ভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্য ভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল তাহাও পাঠক জানেন।

অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অশুভক্ষণে চন্দ্রশেখর তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈবলিনী যাহা, তাহা ক্রমে বলিব কিন্তু সে যাই হউক, ফষ্টরের যত্ন বিফল হইল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে "পুরন্দরপুরের কুঠীতে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" যিনি কুঠীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন ফষ্টরকে সদ্যই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইল।

শৈবলিনীর রূপ ফষ্টরের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। দেখিলেন, শৈবলিনী আশা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। এইসময়ে যে সকল ইংরেজ বাঙ্গালায় বাস করিতেন তাঁহারা দুইটিমাত্র কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। তাঁহারা লোভসংবরণে অক্ষম এবং পরাভবস্বীকারে অক্ষম। তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে, এ কার্য্য পারিলাম না—নিরস্ত হওয়াই ভাল এবং তাঁহারা কখনই স্বীকার করিতেন না যে এ কার্য্যে অধর্ম্ম আছে, অতএব অকর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতবর্ষে প্রথম বৃটেনীয় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী এবং স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য সম্প্রদায় ভূমণ্ডলে কখনও দেখা দেয় নাই।

লরেন্স ফষ্টর সেই প্রকৃতির লোক। তিনি লোভসংবরণ করিলেন না—বঙ্গীয় ইংরেজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল। তিনি সাধ্যাসাধ্যও বিবেচনা করিলেন না। মনে মনে বলিলেন, "Now or never!"

এই ভাবিয়া যেদিন কলিকাতায় যাত্রা করিবেন তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠীর কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সেদিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণপত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই। গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাইতি হইতেছে, অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, বাড়ী লুঠিয়া ডাকাইতেরা একে একে নির্গত হইল; বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠীর সাহেব। দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিল, দ্রব্য-সামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই। কেহ কেহ বলিল—"সে কোথায় লুকাইয়াছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—আসিলেও চন্দ্রশেখর তাহাকে আর ঘরে লইবে না। যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীমধ্যে সে গিয়াছে।" যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষে বসিল, বসিয়া বসিয়া নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল, ঢুলিয়া ঢুলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যে যুবতীকে আমরা প্রথমে পরিচিতা করিয়াছি, সেই সকলের শেষে উঠিয়া গেল।

সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনী কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী। শৈবলিনীর সখী, আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, এ স্থলে এ পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা সমভিব্যাহারে লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাস-দাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন আবার হিন্দু দাস-দাসী কেন?

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর জন্য স্ত্রীলোকের আরোহণোপযোগী যানের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া তিনি যানান্তরে কলিকাতায় গেলেন। এমত শঙ্কা ছিল না যে, তিনি স্বয়ং শৈবলিনীর নৌকার সঙ্গে না থাকিলে, কেহ নৌকা আক্রমণ করিয়া শৈবলিনীর উদ্ধার করিবে। ইংরেজের নৌকা শুনিলে কেহ নিকটে আসিবে না। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

প্রভাতবাতোত্থিত ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—মৃদুনাদী বীচিশ্রেণী তর তর শব্দে নৌকাতলে প্রহত হইতে লাগিল। তোমরা অন্য শঠ, প্রবঞ্চক, ধূর্ত্তকে যত পার বিশ্বাস করিও; কিন্তু প্রভাতবায়ুকে বিশ্বাস করিও না! প্রভাতবায়ু বড় মধুর—চোরের মত টিপি টিপি আসিয়া এখানে পদ্মটি, ওখানে যূথিকাদাম, সেখানে সুগন্ধি বকুলের শাখা লইয়া ধীরে ধীরে ক্রীড়া করে; কাহাকে গন্ধ আনিয়া দেয়, কাহারও নৈশ অঙ্গগ্লানি হরণ করে, কাহারও চিন্তাসন্তপ্ত ললাট স্নিগ্ধ করে, যুবতীর অলকরাজি দেখিলে তাহাতে অল্প ফুৎকার দিয়া পলাইয়া যায়। তুমি নৌকারোহী—দেখিতেছ, এই ক্রীড়াশীল মধুর-প্রকৃতি প্রভাতবায়ু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় নদীকে সুসজ্জিত করিতেছে। আকাশস্থ দু একখানা অল্প কাল মেঘকে সরাইয়া রাখিয়া আকাশকে পরিষ্কার করিতেছে; তীরস্থ বৃক্ষগুলিকে মৃদু-মৃদু নাচাইতেছে; স্নানাবগাহননিরতা কামিনীগণের সঙ্গে একটু একটু মিষ্ট রহস্য করিতেছে; নৌকার তলে প্রবেশ করিয়া তোমার কানের কাছে মধুর সঙ্গীত করিতেছে। তুমি মনে করিলে, বায়ু বড় ধীরপ্রকৃতি—বড় গম্ভীর-স্বভাব; বড় আড়ম্বরশূন্য, আবার সদানন্দ। সংসারে যদি সকলেই এমন হয় ত কি না হয়! দে নৌকা খুলিয়া দে! রৌদ্র উঠিল—তুমি দেখিলে যে বীচিরাজির উপরে রৌদ্র জ্বলিতেছে, সেগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড়

বড় হইয়াছে—রাজহংসগণ তাহার উপর নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছে; গাত্রমার্জ্জনে অন্যমনা সুন্দরীদিগের মৃৎকলসী তাহার উপর স্থির থাকিতেছে না, বড় নাচিতেছে; কখনও কখনও ঢেউগুলা স্পর্দ্ধা করিয়া সুন্দরীদিগের কাঁধে চড়িয়া বসিতেছে; আর যিনি তীরে উঠিয়াছেন, তাঁহার চরণপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িতেছে—মাথা কুটিতেছে—বুঝি বলিতেছে—"দেহিপদপল্লবমুদারম্!" নিতান্ত-পক্ষে পায়ের একটু অলক্তরাগ ধুইয়া লইয়া অঙ্গে মাখিতেছে। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর ডাক একটু একটু বাড়িতেছে, আর সে জয়দেবের কবিতার মত কানে মিশাইয়া যায় না, আর সে ভৈরবী রাগিণীতে কানের কাছে মৃদু বীণা বাজাইতেছে না। ক্রমে দেখিবে, বায়ুর বড় গর্জ্জন বাড়িল—বড় হুহুঙ্কারের ঘটা; তরঙ্গ সকল হঠাৎ ফুলিয়া উঠিয়া মাথা নাড়িয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—অন্ধকার করিল। প্রতিকূল বায়ু নৌকার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, নৌকার মুখ ধরিয়া জলের উপর আছড়াইতে লাগিল—কখন বা মুখ ফিরাইয়া দিল—তুমি ভাব বুঝিয়া পবনদেবকে প্রণাম করিয়া নৌকা তীরে রাখিলে।

শৈবলিনীর নৌকার দশা ঠিক এইরূপ ঘটিল। অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না; রক্ষকেরা ভদ্রহাটীর ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী পরা—শাড়ীর রাঙ্গা দেওয়া আঁচলা আছে—হাতে আলতার চুবড়ী। নাপিতানী নৌকার উপরে অনেক কাল কাল দাড়ী দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। দাড়ীর অধিকারিগণ অবাক্ হইয়া নাপিতানীকে দেখিতেছিল।

একটা চরে শৈবলিনীর পাক হইতেছিল—এখনও হিন্দুয়ানী আছে—একজন ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল। একদিনে কিছু বিবি সাজা যায় না। ফষ্টর জানিতেন যে, শৈবলিনী যদি না পালায় অথবা প্রাণত্যাগ না করে তবে সে অবশ্য একদিন টেবিলে বসিয়া যবনের কৃত পাক উপাদেয় বলিয়া ভোজন করিবে। কিন্তু এখনই তাড়াতাড়ি কি? এখন তাড়াতাড়ি করিলে সকল দিক নষ্ট হইবে। এই ভাবিয়া ফষ্টর ভৃত্যদিগের পরামর্শমতে শৈবলিনীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পাক করিতেছিল, নিকটে একজন দাসী দাঁড়াইয়া উদ্যোগ করিয়া দিতেছিল। নাপিতানী সেই দাসীর কাছে গেল; বলিল, "হাঁ গা, তোমরা কোথা থেকে আসছ গা?"

চাকরাণী রাগ করিল,—বিশেষ সে ইংরেজের বেতন খায়—বলিল, "তোর তা কি রে মাগী। আমরা হিল্লী দিল্লী মক্কা থেকে আসছি।"

নাপিতানী অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"বলি, তা নয়, বলি, আমরা নাপিত—তোমাদের নৌকায় যদি মেয়েছেলে কেহ কামায়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

চাকরাণী একটু নরম হইল। বলিল, "আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" এই বলিয়া সে শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল যে, তিনি আল্‌তা পরিবেন কি না। যে কারণেই হউক, শৈবলিনী অন্যমনা হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আল্‌তা পরিব।" তখন রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া দাসী নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল। সে স্বয়ং পূর্ব্বমত পাকশালার নিকট নিযুক্ত রহিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর একটু ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আল্‌তা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন, "নাপিতানী, তোমার বাড়ী কোথা?"

নাপিতানী কথা কহিল না। শৈবলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাপিতানী, তোমার নাম কি?"

তথাপি উত্তর পাইলেন না।

"নাপিতানী, তুমি কাঁদছ?"

নাপিতানী মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ, কাঁদছ," বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। নাপিতানী কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

শৈবলিনী বলিল, "আমি আসামাত্র চিনেছি। আমার কাছে ঘোমটা? মরণ আর কি। তা এখানে এলি কোথা হ'তে?"

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও। আমার এই শাড়ী পর, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আল্‌তার চুবড়ী নাও। ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন ক'রে?"

সু। কোথা হ'তে আসিলাম—সে পরিচয় দিন পাই ত এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি।

শৈ। একলা এলি কেমন ক'রে ?

সুন্দরীর মুখে আসিল, "তুই কালামুখী, সাহেবের পান্সী চ'ড়ে এলি কেমন ক'রে ?" কিন্তু অসময় বুঝিয়া সে কথা বলিল না। বলিল, "একেলা আসি নাই, আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গী একটু দূরে রাখিয়া আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি।"

শৈ। তারপর ?

সু। তারপর তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আল্‌তার চুবড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে তীরে যাইবে। ডিঙ্গীতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না—ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গী খুলিয়া দিয়া, তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর তোমার দশা ?"

সু। আমার জন্য ভাবিও না। বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসে নাই যে, সুন্দরী বামনীকে নৌকায় পুরিয়া রাখিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, ব্রাহ্মণের স্ত্রী। আমাদের মন দৃঢ় থাকিলে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব। বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা, তুমি আর বিলম্ব করিও না—তোমার নন্দাইয়ের এখনও আহার হয় নাই, আজ হবে কিনা, তাও বলিতে পারি না।

শৈ। ভাল, আমি যেন গেলাম। গেলে সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি ?

সু। ইস্‌ লো—কেন নেবেন না ? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি ?

শৈ। দেখ, ইংরেজ আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে ?

সুন্দরী বিস্মিতা হইয়া শৈবলিনীর মুখপানে চাহিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রতি মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল—ওষধিস্পৃষ্ট বিষধরের ন্যায় গর্ব্বিতা শৈবলিনী মুখ নত করিল। সুন্দরী কিঞ্চিৎ পরুষভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বল্‌বি ?"

শৈ। বলিব।

সু। এই গঙ্গার উপর ?

শৈ। বলিব তোমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অমনি বলিতেছি। সাহেবের

সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই। আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না।

সু। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিও না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, অধর্ম্ম করিবেন না, তবে আর মিছা কথায় সময় নষ্ট করিও না।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিল। একটু কাঁদিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন; কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখনও ঘুচিবে?"

সুন্দরী কোন উত্তর করিল না। শৈবলিনী বলিতে লাগিল, "ইহার পর পাড়ার ছোট মেয়েগুলো আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিবে কি না যে, 'ঐ, উহাকে ইংরেজ লইয়া গিয়াছিল।' ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন আমার পুত্রসন্তান হয়, তবে তাহার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করিলে কে আমার বাড়ী খাইতে আসিবে? যদি কখনও কন্যা হয়, তবে তাহার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরিয়া গেলে কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? আমি ঘরে ফিরিয়া গিয়া কি প্রকারে মুখ দেখাইব?"

সুন্দরী বলিল, "যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—সে ত আর কিছুতেই ফিরিবে না। কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ করিতে হইবে। তথাপি আপনার ঘরে থাকিবে।"

শৈ। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু—

সু। কেন স্বামী? এ নারীজন্ম আর কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান—

সু। জানি যে, পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্গতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ করিয়াছেন! তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত। তুমি পাপিষ্ঠা—তাঁকে তোমার মনে ধরিবে কেন? অন্ধের অধিক অন্ধ তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এত ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে সব কথা দূর হোক্—এখনকার

সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা করিয়া কাল কাটাইতে পারিলেই তোমার জীবন সার্থক। আর বিলম্ব করিতেছ কেন। আমার রাগ হইতেছে।

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই, তবে তাহার গৃহে থাকি। নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব—নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। এখন মুঙ্গের যাইতেছি। যাই, দেখি মুঙ্গের কেমন। দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মরিতে হয়, না হয় মরিব,—মরণ ত হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বৈ আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে—ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না, মনে করিও, আমি মরিয়াছি। আমি মরিব, তাহা নিশ্চয় জানিও, তুমি যাও।

তখন সুন্দরী আর কিছু বলিল না। রোদন সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল; বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া আল্‌তার চুবড়ী জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন; দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ, জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান্ লোকে প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রাজকর্ম্মচারী তাঁহার পাথেয় দিতে সাহস করিলেন না। চন্দ্রশেখর ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন—ভিক্ষা করেন না—কাহারও কাছে দান গ্রহণ করেন না।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে দূর হইতে, চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার মনে আহ্লাদের সঞ্চার হইল। চন্দ্রশেখর তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, আপনা আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বিদেশ হইতে আগমনকালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার-নিদ্রায় কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে পড়িতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এইজন্য আমার এ আহ্লাদ? এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সকলই ব্রহ্ম। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য, কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ। আমার যে তল্পী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্লকমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন? ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি। এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না,—যদি অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব। কতক্ষণে আবার শৈবলিনীকে দেখিব?"

অকস্মাৎ চন্দ্রশেখরের মনে অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল। 'যদি বাড়ী গিয়া শৈবলিনীকে না দেখিতে পাই? কেন পাইব না? যদি পীড়া হইয়া থাকে? পীড়া ত সকলেরই হয়, আরাম হইবে।' চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, 'পীড়ার কথা মনে হওয়াতে এত অসুখ হইতেছে কেন? কাহার না পীড়া হয়? তবে যদি কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকে?" চন্দ্রশেখর দ্রুত চলিলেন। 'যদি পীড়া হইয়া থাকে, ঈশ্বর শৈবলিনীকে আরাম করিবেন, স্বস্ত্যয়ন করিব। যদি পীড়া ভাল না হয়?' চন্দ্রশেখরের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, 'ভগবান্ আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়া আবার কি বঞ্চিত করিবেন? তাহাই বা বিচিত্র কি—আমি কি তাঁহার এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বৈ দুঃখবিধান করিবেন না? হয় ত ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি গিয়া দেখি, শৈবলিনী নাই?—যদি গিয়া শুনি যে, শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? তাহা হইলে আমি বাঁচিব না।' চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন। পল্লীমধ্যে পৌঁছিয়া দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখ-প্রতি অতি গম্ভীরভাবে চাহিয়া দেখিতেছে। চন্দ্রশেখর

সে চাহনীর অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চুপি চুপি হাসিল। কেহ কেহ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—কোন দিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে ভৃত্য বহির্ব্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?" ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল, স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরেরই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি !"

কেহ উত্তর দিল না ; চন্দ্রশেখরের বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল।

চন্দ্রশেখর আবার ডাকিলেন। গৃহমধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত তরণীর উপর গঙ্গাম্বু-সঞ্চারিত-মৃদুপবন-হিল্লোলে ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গাহিতেছিল।

* * * * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহপ্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকাল পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয় শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি সকল একে একে আনিয়া একত্র করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণমধ্যে সাজাইলেন—সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোনখানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন ; সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল। বহুযত্ন-সংগৃহীত, বহুকাল হইতে অধীত, সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া, চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, কেহ জানিলেন না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

পাপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুলসম্

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্।"

দলনী বেগম এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিল। আপনার হস্তের হীরক-জড়িত বলয় খুলিয়া আর একটা ময়ূরের গলায় পরাইয়া দিল। একটা মুখর কাকাতুয়ার মুখে চোখে গোলাবের পিচকারী দিল। কাকাতুয়া 'বাঁদী' বলিয়া গালি দিল। এ গালি দলনী স্বয়ং কাকাতুয়াকে শিখাইয়াছিল।

নিকটে একজন পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিল, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুলসম্ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার বোঝাই দুইখানি কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাতে একজন ইংরেজ চড়ন্দার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, 'নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে।' গুর্‌গন্ খাঁ বলেন, 'লড়াই বাধে বাধুক, নৌকা ছাড়িব না'।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমাবাদের* কুঠিতে যাইতেছে! লড়াই বাধে ত আগে সেইখানে বাধিবে। সেখান হইতে ইংরেজরা হঠাৎ বেদখল না হয় বলিয়া সেথা হাতিয়ার পাঠাইতেছে। এই কথা ত কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র।

দ। তা গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, ইংরেজকে লড়াইয়ে কখন জিতিতে পারিব না। অতএব আমাদের লড়াই না করাই স্থির। তবে নৌকা আটক করিয়া কেন লড়াই বাধাই? ফলে সে কথা সত্য। ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে।

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিল। পরে কহিল, "কুল্‌সম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস্?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর! তামাসা নহে। টের পেলে পর আলিজা তোকে আমাকে হাতীর দুই পায়ের তলে ফেলে দিবেন।

কু। টের পেলে ত? এত আতর-গোলাব, সোনারূপা চুরি করিলাম, কৈ, কেহ ত টের পেলে না। আমার মনে বোধ হয়, পুরুষমানুষের চক্ষু কেবল মাথার শোভার্থ—তাহাতে দেখিতে পায় না। কৈ, পুরুষে মেয়েমানুষের চাতুরী কখন টের পায়, এমন ত দেখিলাম না।

দ। দূর! আমি খোজা খানসামাদের কথা বলি না। নবাব আলিজা অন্য পুরুষের মত নহেন, তিনি না জানিতে পারেন কি?

কু— আমি না লুকাইতে পারি কি? কি করিতে হইবে?

দ। একবার গুর্‌গন্ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

---

* পাটনা

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর দুইটা আপন আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষী আহারে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্‌ বলিল, "কাজ অতি সামান্য, একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে উভয়ে মরিব। যা হোক্‌, তোমাদের কর্ম্ম তুমি জান, আমি দাসী, পত্র দাও আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্‌ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুর্‌গন্‌ খাঁ

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাঁহার নাম গুর্‌গন্‌ খাঁ।

এই সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুর্‌গন্‌ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; তিনি জাতিতে আর্‌মাণি, ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান ; কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে বস্ত্র-বিক্রেতা ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ গুণবিশিষ্ট এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকালমধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, সেনাপতি-পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি নূতন-গোলন্দাজ সেনার সৃষ্টি করেন। ইউরোপীয় প্রথানুসারে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত করিলেন। কামান, বন্দুক যাহা প্রস্তুত করাইলেন, তাহা ইউরোপ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার গোলন্দাজ সেনা সর্ব্বপ্রকারে ইংরেজের গোলন্দাজদিগের তুল্য হইয়া উঠিল। মীর কাসেমের এমন ভরসা ছিল যে, তিনি গুর্‌গন্‌ খাঁর সহায়তায় ইংরেজদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেন। গুর্‌গন্‌ খাঁর আধিপত্যও এতদনুরূপ হইয়া উঠিল ; তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত মীর কাসেম কোন কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার পরামর্শের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে মীর কাসেম তাহা শুনিতেন না। ফলতঃ গুর্‌গন্‌ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুর্‌গন্‌ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন। সেগুলি কলিকাতার কয়েকজন আর্‌মাণির পত্র

পত্র পাঠ করিয়া গুর্‌গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপদার আসিয়া দাঁড়াইল, গুর্‌গন্ খাঁ বলিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে ?"

চোপদার কহিল, "আছে।"

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে ? এ কথা বুঝাইয়া দিয়াছ ?

চোপদার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাক।

তখন গুর্‌গন্ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্তস্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এখন কোন্ পথে যাই ? এই ভারতবর্ষ এখন সমুদ্রবিশেষ—যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে। তীরে বসিয়া ঢেউ গণিলে কি হইবে ? দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির ; আমিই বাঙ্গালার কর্ত্তা। আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা ? কে কর্ত্তা ? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীর কাসেম ; আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম। বড় উচ্চপদ ! আমি বাঙ্গালার কর্ত্তা না হই কেন ? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে ? ইংরেজ ! একবার পেলে হয়। কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে আমি কর্ত্তা হইতে পারিব না। আমি বাঙ্গালার অধিপতি হইতে চাহি—মীর কাসেমকে গ্রাহ্য করি না। যেদিন মনে করিব, সেইদিন উহাকে মসনদ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিব। সে কেবল আমার উচ্চপদে আরোহণের সোপান—এখন ছাদে উঠিয়াছি, মই ফেলিয়া দিতে পারি ; কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তাহারা আমাকে হস্তগত করিতে চাহে—আমি তাহাদিগকে হস্তগত করিতে চাহি। তাহারা হস্তগত হইবে না। অতএব আমি তাহাদের তাড়াইব। এখন মীর কাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেইজন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীর কাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ পত্র পাইলাম কেন ? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন ?

বলিতে বলিতে যাহার কথা ভাবিতেছিলেন, সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। সে দলনী বেগম।

গুর্‌গন্ খাঁ বলিলেন, "আজি অনেকদিনের পর তোমাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। কিন্তু এ দুঃসাহসিক কাজ কেন করিলে ?"

দলনী বলিল, "দুঃসাহসিক কিসে ?"

গুর্‌গন্‌ খাঁ কহিল, "তুমি নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে আমাকে দুইজনকে বধ করিবেন।"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব, তাহা হইলে রাগ করিবার আর কোন কারণ থাকিবে না।

গুর্‌। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করিতেছ। এতদিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। তুমি যে আমাকে চেন বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা এ পর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ করি নাই—এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে ? বলিবে, এ কেবল বাঁচিবার উপায়। তুমি আসিয়া ভাল কর নাই।

দ। নবাব জানিবার সম্ভাবনা কি ? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী—আপনার প্রদত্ত নিদর্শন দেখিয়া তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি—ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ কথা কি সত্য ?

গুর্‌। এ কথা কি তুমি দুর্গে বসিয়া শুনিতে পাও না ?

দ। পাই, কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত এবং আপনিই এই যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন।—কেন ?

গুর্‌। তুমি বালিকা, তাহা কি প্রকারে বুঝিবে ?

দ। আমি বালিকার মত কথা কহিতেছি, না বালিকার ন্যায় কাজ করিয়া থাকি ? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে বালিকা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলে কি হইবে ?

গুর্‌। হউক, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি ? হউক না।

দ। আপনারা কি জয়ী হইতে পারিবেন ?

গুর্‌। আমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দ। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতিয়াছে ?

গুর্‌। ইংরেজরা কয়জন গুর্‌গন্‌ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে ?

দ। সিরাজউদ্দৌলা তাহাই মনে করিয়াছিলেন। যাক্‌—আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হইতেছে যে, কে

াতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ যুদ্ধে আমাদের র্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দবেন না।

গুর্। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দ। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া দলনী রোদন করিতে লাগিল।

গুর্গন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন ? না হয় মীর কাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাসেম আমার স্বামী ?"

গুর্গন্ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে।"

দলনী ক্রোধে কম্পিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল। গলদশ্রু নিরুদ্ধ করিয়া লোচন-যুগল বিস্ফারিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "তুমি নিপাত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন ? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমিও জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্গন্ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, দলনী আর এক্ষণে তাঁহার নহে, সে মীর কাসেমের হইয়াছে। ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে স্নেহ করিলে করিতে পারে, কিন্তু সে মীর কাসেমের প্রতি অধিকতর স্নেহবতী। তাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী বলিয়া যখন বুঝিয়াছে বা বুঝিবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থ ভ্রাতার অমঙ্গল করিতে পারে। অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্‌গন্ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

অশ্বারোহণে দূত আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছিল। দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শুনিয়া দলনী ক্রমে ক্রমে ছিন্নবল্লরীবৎ ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। চক্ষু দিয়া ধারা বহিতে লাগিল। বলিলেন, "ভাই, আমার দাঁড়াইবার স্থান রাখিলে না?"

কুল্‌সম্ বলিল, "ফিরিয়া সেনাপতির গৃহে চল।"

দলনী বলিল, "তুমি যাও। গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে।"

সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপর নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—বৃক্ষ হইতে প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধ আসিতেছিল—ঈষৎ পবন-হিল্লোলে অন্ধকারাবৃত বৃক্ষপত্র সকল মর্ম্মরিত হইতেছিল। দলনী কাঁদিয়া বলিল, "কুল্‌সম্!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলনীর কি হইল?

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবেন?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি, তা তুমিই জান। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচার কর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। না হয় মরিব। ক্ষতি কি?

কু। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে?

দ। এখানে দাঁড়াইয়া ধরা পড়িব—সেই উদ্দেশ্যেই এখানে দাঁড়াইব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত করিবে, সে আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?

কু। দরবারে।

দ। প্রভুর কাছে? আমি সেইখানেই যাইতে চাই। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মরণকালে তাঁহাকে বলিতে পাইব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়া বসিয়া থাকি—সেইখানেই শীঘ্র ধরা পড়িব।

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিল, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি গঙ্গা-তীরাভিমুখে যাইতেছে। তাহারা বৃক্ষতলস্থ অন্ধকারমধ্যে গিয়া লুকাইল। পুনশ্চ সভয়ে দেখিল, দীর্ঘাকার পুরুষ গঙ্গার পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই আশ্রয়বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিল, দেখিয়া স্ত্রীলোক দুইটি আরও অন্ধকারমধ্যে লুকাইল।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিল। বলিল, "এখানে তোমরা কে?" এই কথা বলিয়া, সে যেন আপনা আপনি মৃদুস্বরে বলিল, "আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?"

দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগের ভয় জন্মিয়াছিল, কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। কণ্ঠ অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। কুলসম্ কহিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?"

পুরুষ কহিলেন, "আমরা? তোমরা কয়জন?"

কু। আমরা দুইজন মাত্র।

পু। এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?

তখন দলনী বলিল, "আমরা হতভাগিনী—আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে?"

তখন আগন্তুক বলিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি; সামান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃকও লোকের উপকার হইয়া থাকে। তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাক—সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার করিব।"

দ। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য—আপনি কে?

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। যে ডুবিয়া মরিতেছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ শুনিতে চান্, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বলিবার নহে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া

তিনি দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন। এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

রামচরণ প্রদীপ জ্বালিয়া ব্রহ্মচারীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী তখন রামচরণকে বলিলেন, "তুমি গিয়া শয়ন কর।" শুনিয়া রামচরণ একবার দলনী ও কুল্‌সমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, রামচরণ সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিল না। ঠাকুরজী এত রাতে দুইজন স্ত্রীলোক লইয়া কেন আসিলেন? এই ভাবনা তাহার প্রবল হইল। ব্রহ্মচারীকে রামচরণ দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিত—সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। শেষে রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয় এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন—কি জ্বালা, কথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না?"

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া ব্রহ্মচারী মনে মনে ভাবিলেন, "ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অবশ্য করিব।"

হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পুড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না। ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন। পরে তাঁহার আজ্ঞা পাইলে সম্মুখে উপস্থিত হইবেন।"

দ। পত্র লইয়া যাইবে কে?

ব্র। আমি পাঠাইয়া দিব।

তখন দলনী কাগজ কলম চাহিলেন। ব্রহ্মচারী রামচরণকে আবার উঠাইলেন। রামচরণ কাগজ কলম ইত্যাদি আনিয়া রাখিয়া গেল। দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মচারী ততক্ষণ বলিতে লাগিলেন, "এ গৃহ আমার নহে; কিন্তু যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা-প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ এইখানেই থাকুন—কেহ জানিতে পারিবে না, বা কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।"

অগত্যা স্ত্রীলোকরা তাহা স্বীকার করিল। লিপি সমাপ্ত হইলে, দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন। মুঙ্গেরের যে সকল রাজকর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত। সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না; এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।" মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না। ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার, পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোন প্রকারে অদ্য কাল যাপন কর।"

রামচরণ প্রভাতে আসিয়া দেখিল, সহমরণের কোন উদ্যোগ নাই।

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত পথ স্বামীর নিকটে শৈবলিনাকে গালি দিতে দিতে আসিয়াছিল। কখনও "অভাগী", "পোড়ারমুখী", কখন "চুলোমুখা" ইত্যাদি প্রিয় সম্বোধনে শৈবলিনীকে অভিহিত করিয়া স্বামীর কৌতুকবর্দ্ধন করিতে করিতে আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তারপর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তারপর

কিছুদিন অমনি অমনি গেল। শৈবলিনীর বা চন্দ্রশেখরের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। তখন সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া গহনা পরিতে বসিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসি-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ, প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। শৈবলিনীর বিপদ্‌কালে যে শ্রীনাথ বেদগ্রামে ছিলেন, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরীই বাড়ীর গৃহিণী, তাঁহার মাতা রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য। সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুরবাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী ঢাকাই শাটী পরিয়া অলঙ্কার সন্নিবেশপূর্ব্বক পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব—তাহার বিষয়ে বড় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" সুন্দরীর পিতা কৃষ্ণকমল চক্রবর্ত্তী কন্যার বশীভূত, একটু আধটু আপত্তি করিয়া সম্মত হইলেন। সুন্দরী, রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেলেন—শ্রীনাথ স্বগৃহে গেলেন।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ! শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনি রূপসী বয়ঃস্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে। চন্দ্রশেখর, কাসেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা; —তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরী করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া, সাদরে গৃহে লইয়া গেল। প্রতাপ আসিয়া শ্যালীকে রহস্যসম্ভাষণ করিলেন।

পরে অবকাশমতে প্রতাপ, সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিলেন, "আমি সেই কথা বলিতেই আসিয়াছি, বলি শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। শুনিয়া, প্রতাপ বিস্মিত এবং স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া, প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এত দিন আমাকে এ কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন?"

সু। কেন, তোমাকে বলিয়া কি হইবে ?

প্র। কি হইবে ? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই করিব না। আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।

সু। তুমি উপকার করিবে কি না, তা জানিব কি প্রকারে ?

প্র। কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে ?

সু। জানি। কিন্তু শুনিয়াছি, লোকে বড়মানুষ হইলে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যায়।

প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া, অধীর এবং বাক্যশূন্য হইয়া উঠিয়া গেলেন। রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল।

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম ; সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সেই প্রতাপের বাসা।

সুন্দরী কিছু দিন ভগিনীর নিকটে থাকিয়া, আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া, শৈবলিনীকে গালি দিল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, সুন্দরী, রূপসীর নিকট প্রমাণ করিতে বসিত যে, শৈবলিনীর তুল্য পাপিষ্ঠা, হতভাগিনী আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। একদিন রূপসী বলিল, "তা ত সত্য, তবে তুমি তার জন্য এত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতেছ কেন ?"

সুন্দরী বলিল, "তার মুণ্ডপাত করিব ব'লে—তাঁকে যমের বাড়ী পাঠাব ব'লে—তাঁর মুখে আগুন দিব ব'লে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপসী বলিল, "দিদি, তুই বড় কুঁদুলী !"

সুন্দরী উত্তর করিল, "সেই ত আমায় কুঁদুলী করেছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস্ সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক

হইল। আমিয়ট্ সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিস্‌কে কোন প্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব এক জন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠান আবশ্যক হইল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এই সকল কার্য্যের জন্য গভর্ণর বান্সিটার্ট ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। তিনি অস্ত্রের নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পাটনা যাইবেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ সকল বৃত্তান্তের সম্বাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গের পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গের আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইলেন, কিন্তু এমত সময়ে গুর্‌গন্ খাঁ নৌকা আটক করিলেন। তখন আমিয়টের সঙ্গে নবাবের বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। অদ্য আমিয়টের সঙ্গে ফষ্টরের এই কথা স্থির হইল যে, যদি নবাব নৌকা ছাড়িয়া দেন, ভালই; নচেৎ কাল প্রাতে ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা ফেলিয়া পাটনায় চলিয়া যাইবেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আকারে বড় বৃহৎ—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহী। এইখানিতেই অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের উপর এক জন "তেলিঙ্গা" নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর। অন্ধকার রাত্র, কিন্তু পরিষ্কার। বজরার পাহারাওয়ালারা একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার ঢুলিতেছে। তীরে একটা কসাড় বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে

ধীরে জলে নামিলেন, প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুম্‌দার ?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়া ছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া, বজরার মধ্য হইতে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমন সময়ে কসাড় বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলীর দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ যখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র, ভড়ের সিপাহীরা "কিয়া হৈ রে ?" বলিয়া গোলযোগ করিয়া উঠিল। নৌকার অপরাপর লোক জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

লরেন্স ফষ্টর বাহিরে আসিয়া চারি দিক্‌ ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার "তেলিঙ্গা" প্রহরী অন্তর্হিত হইয়াছে—নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, তাহার মৃতদেহ ভাসিতেছে। প্রথমে মনে করিলেন, নবাবের সিপাহীরা মারিয়াছে—কিন্তু তখনই কসাড় বনের দিকে অল্প ধূমরেখা দেখিলেন। আরও দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গের দ্বিতীয় নৌকার লোক সকল বৃত্তান্ত কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে; গঙ্গাকূলে শত শত বৃহত্তরণী-শ্রেণী, অন্ধকারে নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে—কল কল রবে অনন্তপ্রবাহিনী গঙ্গা ধাবিত হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে। পলকমধ্যে ফষ্টর এই সকল দেখিলেন।

কসাড় বনের উপর ঈষত্তরল ধূমরেখা দেখিয়া, ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফষ্টর বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, এই বনান্তরালে লুক্কায়িত শত্রু আছে। ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, যে শত্রু অদৃশ্য থাকিয়া প্রহরীকে নিপাত করিয়াছিল, সে এখনই তাঁহাকেও নিপাত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পলাসীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, এ কথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশী শত্রুকে ভয় করিবে—তাহার মৃত্যু ভাল। এই ভাবিয়া তিনি সেইখানে দাঁড়াইয়া বন্দুক উত্তোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে কসাড় বনের ভিতর অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল—আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া, প্রহরীর ন্যায় গঙ্গাস্রোতোমধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেই সময়, কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া, বজরার বন্ধনরজ্জু সকল কাটিলেন। সেখানে জল অল্প, স্রোতঃ মন্দ বলিয়া নাবিকেরা নঙ্গর ফেলে নাই। ফেলিলেও লঘুহস্ত, বলবান্ প্রতাপের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিত না। প্রতাপ এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

এই ঘটনাগুলি বর্ণনায় যে সময় লাগিয়াছে, তাহার শতাংশ সময় মধ্যেই সে সকল সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রহরীর পতন, ফষ্টরের বাহিরে আসা, তাঁহার পতন, এবং প্রতাপের নৌকারোহণ, এই সকলে যে সময় লাগিয়াছিল, ততক্ষণে দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও আসিল।

আসিয়া দেখিল, নৌকা প্রতাপের কৌশলে বাহির-জলে গিয়াছে। একজন সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিতে আসিল, প্রতাপ একটা লগি তুলিয়া তাহার মস্তকে মারিলেন। সে ফিরিয়া গেল। আর কেহ অগ্রসর হইল না। সে লগিতে জলতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রতাপ আবার নৌকা ঠেলিলেন। নৌকা ঘুরিয়া গভীর স্রোতোমধ্যে পড়িয়া বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিল।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর একজন "তেলিঙ্গা" সিপাহী নৌকার ছাদের উপর জানু পাতিয়া, বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল—বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। ফষ্টরের হস্তচ্যুত বন্দুকও তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়। নবাবও আমাকে ভয় করেন। এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ী—বোধ হয় তোমাদের কয়জনকে একেলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে কাহাকেও কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর আর সকলে যেখানে যে আছ,—সেইখানে থাক। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে এক একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড় সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল। ভড়ের উপর হইতে দুই একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল, কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিতে হইবে নক্ষত্রালোকে তাহা কিছু কেহ অবধারিত করিতে না পারাতে সে শব্দ তখনই নিবারিত হইল।

তখন ভড় হইতে জন কয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গীতে উঠিয়া, বজরা

ধরিতে আসিল। প্রতাপ প্রথমে কিছু বলিলেন না। তাহারা নিকটে আসিলে, দুইটি বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুই জন লোক আহত হইল। অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া, ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড় বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং ভড়ের সিপাহিগণ কসাড় বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই নৈশ-গঙ্গাবিচারিণী তরণী মধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিল—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর একটিতে শৈবলিনী এবং তাঁহার দাসী। শৈবলিনী এখনও বিবি সাজে নাই—পরণে কালাপেড়ে শাড়ী, হাতে বালা, পায়ে মল—সঙ্গে সেই পুরন্দরপুরের দাসী পার্ব্বতী। শৈবলিনী নিদ্রিতা ছিল—শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—সেই ভীমা পুষ্করিণীর চারিপাশে জলসংস্পর্শ-প্রার্থিশাখারাজিতে বাপীতীর অন্ধকারের রেখাযুক্ত—শৈবলিনী যেন তাহাতে পদ্ম হইয়া মুখ ভাসাইয়া রহিয়াছে। সরোবরের প্রান্তে যেন এক স্বর্ণনির্ম্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেতশূকর বেড়াইতেছে। রাজহংস দেখিয়া, তাহাকে ধরিবার জন্য শৈবলিনী যেন উৎসুক হইয়াছে; কিন্তু রাজহংস তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। শূকর শৈবলিনীপদ্মকে ধরিবার জন্য ফিরিয়া বেড়াইতেছে, রাজহংসের মুখ দেখা যাইতেছে না, কিন্তু শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফষ্টরের মুখের মত। শৈবলিনী রাজহংসকে ধরিতে যাইতে চায়, কিন্তু চরণ মৃণাল হইয়া জলতলে বদ্ধ হইয়াছে—তাহার গতিশক্তি রহিত। এদিকে শূকর বলিতেছে, "আমার কাছে আইস, আমি হাঁস ধরিয়া দিব।" প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পড়িবার শব্দ শুনিল। অসম্পূর্ণ—ভগ্ন নিদ্রার আবেশে কিছুকাল বুঝিতে পারিল না। সেই রাজহংস—সেই শূকর মনে পড়িতে লাগিল। যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল, এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাহিরের কামরায় আসিয়া দ্বার হইতে একবার দেখিল—কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার ভিতরে আসিল। ভিতরে আলো জ্বলিতেছিল। পার্ব্বতীও উঠিয়াছিল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে—সাহেবকে মারিয়া ফেলিয়াছে—আমাদেরই পাপের ফল।

শৈ। সাহেবকে মারিয়াছে, তাতে আমাদের পাপের ফল কি? সাহেবেরই পাপের ফল।

পা। ডাকাত পড়িয়াছে—বিপদ্ আমাদেরই।

শৈ। কি বিপদ্? এক ডাকাতের সঙ্গে ছিলাম, না হয়, আর এক ডাকাতের সঙ্গে যাইব। যদি গোরা ডাকাতের হাত এড়াইয়া কালা ডাকাতের হাতে পড়ি, তবে মন্দ কি?

এই বলিয়া, শৈবলিনী ক্ষুদ্র মস্তক হইতে পৃষ্ঠোপরি বিলম্বিত বেণী আন্দোলিত করিয়া, একটু হাসিয়া, ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল। পার্ব্বতী বলিল, "এ সময়ে তোমার হাসি আমার সহ্য হয় না।" শৈবলিনী বলিল, "অসহ্য হয়, গঙ্গায় জল আছে, ডুবিয়া মর। আমার হাসির সময় উপস্থিত হইয়াছে, আমি হাসিব। একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আন না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না, তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারি দণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না। শৈবলিনী তখন দুঃখিত হইয়া বলিল, "আমাদের কি কপাল! ডাকাতেরাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না।" পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া, এক চরে লাগিল। নৌকা সেইখানে কিছুক্ষণ লাগিয়া রহিল। পরে তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। প্রথমে সে, পার্ব্বতীর মুখপ্রতি চাহিয়া শেষে শৈবলিনীকে দেখিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে,—কোথায় যাইব?" রামচরণ বলিল "আমি আপনার চাকর। কোন চিন্তা নাই—আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে গাত্রোত্থান করিয়া রামচরণের সঙ্গে আসিল। রামচরণের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামিল। পার্ব্বতী সঙ্গে যাইতেছিল—রামচরণ তাহাকে

নিষেধ করিল। পার্ব্বতী ভয়ে নৌকার মধ্যেই রহিল। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন। রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখনও দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিল। তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাহারা ছিল, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না, উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার বাড়ী?" রামচরণ সে কথা কানে তুলিল না।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল, প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, পাল্কী জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাইও। রামচরণ পথে ভাবিল—"এ রাত্রে জগৎশেঠের ফটক খোলা পাইব কি না? দ্বারবানেরা প্রবেশ করিতে দিবে কি না? জিজ্ঞাসিলে কি পরিচয় দিব? পরিচয় দিয়া কি আমি খুনে বলিয়া ধরা পড়িব? সে সকলে কাজ নাই; এখন বাসায় যাওয়াই ভাল।" এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল।

এ দিকে প্রতাপ, পাল্কী চলিয়া গেল দেখিয়া, নৌকা হইতে নামিলেন। পূর্ব্বেই সকলে তাঁহার হাতে বন্দুক দেখিয়া, নিস্তব্ধ হইয়াছিল—এখন তাঁহার লাঠিয়াল সহায় দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া আত্মগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "এখনও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া জগৎশেঠের গৃহে লইয়া যাও। ডাকিয়া লইয়া আইস।"

রামচরণ আসিয়া দেখিল—লোকে শুনিয়া বিস্মিত হইবে—শৈবলিনী নিদ্রা যাইতেছেন। এ অবস্থায় নিদ্রা সম্ভবে না। সম্ভবে কি না, তাহা আমি জানি না,—আমরা যেমন ঘটিয়াছে, তেমনই লিখিতেছি। রামচরণ শৈবলিনীকে জাগরিতা না করিয়া প্রতাপের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি ঘুমাইতেছেন, ঘুম ভাঙ্গাইব কি?" শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত হইলেন—মনে মনে বলিলেন, চাণক্য পণ্ডিত লিখিতে ভুলিয়াছেন,—নিদ্রা স্ত্রীলোকের ষোল গুণ। প্রকাশ্যে বলিলেন,

"এত পীড়াপীড়িতে প্রয়োজন নাই। তুমিও ঘুমাও—পরিশ্রমের একশেষ হইয়াছে। আমিও এখন একটু বিশ্রাম করিব।"

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। তখনও কিছু রাত্রি আছে। গৃহ—গৃহের বাহিরে নগরী—সর্ব্বত্র শব্দহীন, অন্ধকার। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। আপন শয়নকক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন—দেখিলেন, পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছিল।

প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন যে, শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে। যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেত-বারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত-পদ্ম-রাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। মনোমোহিনী স্থিরশোভা! দেখিয়া প্রতাপ সহসা চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। সৌন্দর্য্যেমুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা প্রযুক্ত যে, তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমত নহে—কেবল অন্যমন বশতঃ তিনি বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—অকস্মাৎ স্মৃতি-সাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল।

শৈবলিনী নিদ্রা যান নাই—চক্ষু মুদিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন। চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া, রামচরণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, শৈবলিনী নিদ্রিতা। গাঢ় চিন্তাবশতঃ প্রতাপের প্রথম প্রবেশের পদধ্বনি শৈবলিনী শুনিতে পান নাই। প্রতাপ বন্দুকটি হাতে করিয়া উপরে আসিয়াছিলেন। এখন বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। কিছু অন্যমনা হইয়াছিলেন—সাবধানে বন্দুকটি রাখা হয় নাই; বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এ কি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ জল আনিয়া মূর্চ্ছিতা শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন—সে মুখ শিশির-নিষিক্ত-পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল। জল, কেশগুচ্ছ সকল আর্দ্র করিয়া কেশগুচ্ছ সকল ঋজু করিয়া ঝরিতে লাগিল—কেশ, পদ্মাবলম্বী শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল।

অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। প্রতাপ দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণে ভ্রান্তি মনে করিলাম।

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনা বাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন। শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী বস্তুতঃ সুস্থিরা হন নাই। হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি আর একটু নীরব থাকিয়া, ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া পুনরপি বলিলেন, "আমাকে এখানে কে আনিল?"

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরাই? আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে? তোমাদের কি প্রয়োজন?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন; বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিতে নাই। তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হইতে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আনিলে?"

শৈবলিনী ক্রোধ দেখিয়া ক্রোধ করিলেন না—বিনীতভাবে প্রায় বাষ্পগদ্‌গদ্ হইয়া বলিলেন—"যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা এত দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছিলে—তবে আমাকে সেই স্থানে মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল।"

প্রতাপ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাও করিতাম—কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নাই; কিন্তু তোমার মরণই ভাল।"

শৈবলিনী কাঁদিল। পরে রোদন সংবরণ করিয়া বলিল,—"আমার মরাই ভাল—কিন্তু অন্যে যাহা বলে বলুক—তুমি আমায় এ কথা বলিও না। আমার এ দুর্দ্দশা কাহা হ'তে?—তোমা হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করিয়াছে? —তুমি! কাহার জন্য সুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুপথ-সুপথ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি? —তোমার জন্য। কাহার জন্য দুঃখিনী হইয়াছি?—তোমার জন্য। কাহার জন্য

আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখিতে পারিলাম না ?—তোমারই জন্য। তুমি আমায় গালি দিও না।"

প্রতাপ কহিলেন, "তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গালি দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ—তোমার প্রবৃত্তির দোষ। তুমি পাপিষ্ঠা তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করিয়াছি ?"

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—বলিল, "তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্ত্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়েছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, আবার তাহা কেন উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি, এ আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে ?"

শুনিয়া প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন করিলেন।

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা বড় গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গল্‌ষ্টন্‌, ও জন্‌সন্‌

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা সিপাহী প্রতাপের আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপরে বসিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে, সেই পথে চলিল। অতি দূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম বকাউল্লা খাঁ। ক্লাইবের সঙ্গে প্রথম যে সেনা বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, তাহারা

মান্দ্রাজ হইতে আসিয়াছিল বলিয়া, ইংরেজদিগের দেশী সৈনিকগণকে তখন বাঙ্গালাতে তেলিঙ্গা বলিত; কিন্তু এক্ষণে অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজসেনা-ভুক্ত হইয়াছিল। বকাউল্লার নিবাস গাজিপুরের নিকট।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট-সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, কুঠিতে একটা বড় গোল পড়িয়া গিয়াছে। বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল—তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল, বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।" আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল—কুঞ্চিত ভ্রূ ঋজু হইল—তিনি চারি জন সিপাহী এবং এক জন নাএককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন যে, "দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া এখনই আমার নিকটে লইয়া আইস।" বকাউল্লা কহিল, "তবে দুই জন ইংরেজ সঙ্গে দিউন—প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এ দেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গলষ্টন্ ও জন্‌সন্ নামক দুই জন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন।

গমনকালে গলষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সে বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গলষ্টন্ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাইও লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন ইংরেজদিগের রণযাত্রার গভীর পদনিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাতে পশ্চাতে চারিজন সিপাহী, নাএক ও বকাউল্লা চলিল। নগর-প্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গলষ্টন্ ও জন্‌সন্ সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া, দ্বারে ধীরে ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিত

হস্ত। বস্ত্র-কুঞ্চনে, অঙ্গরাগকরণে বড় পটু। রামচরণের মত ফরাশ নাই—তার মত দ্রব্যক্রেতা দুর্লভ। কিন্তু এ সকল সামান্য গুণ; রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ প্রদেশে প্রসিদ্ধ, অনেক হিন্দু ও যবন তাহার হস্তের গুণে ধরাশয়ন করিয়াছিল। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফষ্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি সময়োপযোগী গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, "এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? ঠাকুর মশায়? বোধ হয়; কিন্তু যা হোক, একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি—রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না।"

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া কিয়ৎক্ষণ দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুই জনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃতভাষায় কথা করিতেছে—রামচরণ তাহাকে "ইণ্ডিল-মিণ্ডিল" বলিত—এখনকার লোক বলে ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, "রসো বাবা! দুয়ার খুলি ত বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল-মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা!"

রামচরণ আরও ভাবিল, "বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।" এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এই সময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিল, "অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিল। দ্বার খড়-খড়, ছড়-ছড়, ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল; রামচরণ দৌড়িল। শব্দ প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সে বার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিল কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" বলিয়া ইংরেজরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহিগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সঙ্গে প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও—ইংরেজ আসিয়াছে—বোধ হয় আমবাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আট জন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদিগের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণ সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বৰ্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বৰ্ত্তিকার আলোকে ইংরেজেরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুই জন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল—সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হ্যাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊৰ্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ চরণে আহত হইল, চলিবার শক্তিরহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?"

গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপর বন্দুক হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জুনাব, এই ব্যক্তি সর্‌দার।"

জন্‌সন্ প্রতাপের এক হাত ধরিল, গল্‌ষ্টন্ আর এক হাত ধরিল। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নাএকের হাতে হাত-কড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্ পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওটা?" জন্‌সন্ দুই জন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকে লইয়া আইস। দুই জন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এই সকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগরিত হইয়া মহাভয়

পাইয়াছিল। তাহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র মুক্ত করিয়া এইসকল দেখিতেছিল। সিঁড়ির পাশে তাহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজরা প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক অকস্মাৎ ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে দলনীর নীলমণিপ্রভ চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি।"

গল্‌ষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত! কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন্ ঐ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্ মহা ভীত এবং লুপ্তবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিল। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাপের বিচিত্র গতি

যেমন যবনকন্যারা অল্প দ্বার খুলিয়া আপনাদিগের শয়নগৃহ হইতে দেখিতেছিল, শৈবলিনীও সেইরূপ দেখিতেছিল। তিন জনই স্ত্রীলোক, সুতরাং স্ত্রীজাতি-সুলভ কুতূহলে তিন জনেই পীড়িতা; তিন জনেই ভয়ে কাতরা। ভয়ের স্বধর্ম্ম ভয়ানক বস্তুর দর্শন পুনঃ পুনঃ কামনা করে। শৈবলিনীও আদ্যোপান্ত দেখিল। সকলে চলিয়া গেলে গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শয্যোপরি বসিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিল।

ভাবিল, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই, মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ নাই। যে স্বয়ং অহরহঃ মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ। সহজই বা কিসে? এতদিন জলে বাস করিলাম, কৈ, এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। রাত্রে যখন সকলে ঘুমাইত, ধীরে ধীরে নৌকার বাহিরে আসিয়া জলে ঝাঁপ দিলে কে ধরিত? ধরিত—নৌকায় পাহারা থাকিত। কিন্তু আমিও

ত কোন উদ্যোগ করি নাই।—তখনও আমার আশা ছিল—আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না। প্রতাপের কি হয়? যা হৌক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে তাহা জানি না। সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জ্বলন্ত বহ্নি—সে এই সংসারপ্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম না?"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল। যেখানে প্রাচীর-পার্শ্বে শৈবলিনী স্বহস্তে করবীর বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল—সেই করবীর সর্ব্বোচ্চ শাখা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া রক্তপুষ্প ধারণ করিয়া নীলাকাশকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া দুলিত, কখনও তাহাতে ভ্রমর বা ক্ষুদ্র পক্ষী আসিয়া বসিত, তাহা মনে পড়িল। তুলসীমঞ্চ—তাহার চারিপার্শ্বে পরিষ্কৃত সুমার্জ্জিত ভূমি, গৃহপালিত মার্জ্জার, পিঞ্জরে স্ফুটবাক্ পক্ষী, গৃহপার্শ্বে সুস্বাদু আম্রের উচ্চ বৃক্ষ—সকল স্মরণপটে চিত্রিত হইতে লাগিল। কত কি মনে পড়িল। কত সুন্দর, সুনীল, মেঘশূন্য আকাশ শৈবলিনী ছাদে বসিয়া দেখিতেন; কত সুগন্ধ প্রস্ফুটিত ধবলকুসুম পরিষ্কার জলসিক্ত করিয়া, চন্দ্রশেখরের পূজার জন্য পুষ্পপাত্র ভরিয়া রাখিয়া দিতেন; কত স্নিগ্ধ, মন্দ, সুগন্ধি বায়ু ভীমাতটে সেবন করিতেন; জলে কত ক্ষুদ্র তরঙ্গে স্ফটিকবিক্ষেপ দেখিতেন, তাহার তীরে কত কোকিল ডাকিত। শৈবলিনী আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "মনে করিয়াছিলাম, গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে দেখিব। মনে করিয়াছিলাম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠীতে ফিরিয়া যাইব—প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট; কুঠীর বাতায়নে বসিয়া কটাক্ষজাল পাতিয়া প্রতাপ-পক্ষীকে ধরিব, সুবিধা বুঝিলে সেখান হইতে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইব, গিয়া প্রতাপের পদতলে লুটাইয়া পড়িব। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জানিতাম না। জানিতাম না যে, মনুষ্যে গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গে; জানিতাম না যে, ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর—আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিনিলাম, জাতি হারাইলাম, পরকাল নষ্ট করিলাম।" পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর এ কথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে এ কথা বুঝিবে, একদিন প্রায়শ্চিত্ত জন্য সে অস্থি পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে

প্রবৃত্ত হইবে; সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপ-চিত্রের অবতারণা করিতাম না। পরে সে ভাবিতে লাগিল, "পরকাল? সে ত যেদিন প্রতাপকে দেখিয়াছি, সেইদিন গিয়াছে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি সেইদিনই আমার কপালে নরক লিখিয়াছেন। ইহকালেও আমার নরক হইয়াছে—আমার মনই নরক—নহিলে এত দুঃখ পাইলাম কেন? নহিলে দুই চক্ষের বিষ ফিরিঙ্গীর সঙ্গে এত কাল বেড়াইলাম কেন? শুধু কি তাই! বোধ হয়, যাহা কিছু আমার ভাল,—তাহাতেই অগ্নি লাগে, বোধ হয়, আমারই জন্য প্রতাপ এই বিপদগ্রস্ত হইয়াছে—আমি কেন মরিলাম না?"

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে চক্ষু মুছিল; ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; অধর দংশন করিল; ক্ষণকাল জন্য তাহার প্রফুল্ল রাজীবতুল্য মুখ রুষ্ট সর্পের চক্রের ভীমকান্তি শোভা ধারণ করিল। সে আবার বলিল, "মরিলাম না কেন?" শৈবলিনী সহসা কটি হইতে একটি 'গেঁজে' বাহির করিল। তন্মধ্যে তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র ছুরিকা ছিল। শৈবলিনী ছুরিকা গ্রহণ করিল। তাহার ফলক নিকোষিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তৎসহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। বলিল, "বৃথা কি এ ছুরি সংগ্রহ করিয়াছিলাম? কেন এতদিন এ ছুরি আমার পোড়া বুকে বসাই নাই? কেন—কেবল আশায় মজিয়া। এখন?" এই বলিয়া শৈবলিনী ছুরিকাগ্রভাগ হৃদয়ে স্থাপিত করিল। ছুরি সেইভাবে রহিল। শৈবলিনী ভাবিতে লাগিল, "আর একদিন ছুরি এইরূপে নিদ্রিত ফষ্টরের বুকের উপর ধরিয়াছিলাম; সেদিন তাহাকে মারি নাই। সাহস হয় নাই; আজিও আত্মহত্যায় সাহস হইতেছে না। এই ছুরির ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হইয়াছিল, সে বুঝিয়াছিল যে, সে আমার কামরায় প্রবেশ করিলে, এই ছুরিতে হয় সে মরিবে, নয় আমি মরিব; দুরন্ত ইংরেজ ইহার ভয়ে বশ হইয়াছিল—আমার এ দুরন্ত হৃদয় ইহার ভয়ে বশ হইল না। মরিব? না, আজ নহে। মরি ত সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব। সুন্দরীকে বলিব যে, আমার জাতি নাই, কুল নাই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নহি। তারপর মরিব।—আর তিনি—আর যিনি আমার স্বামী—তাঁহাকে কি বলিয়া মরিব? কথা ত মনে করিতে পারি না। মনে করিলে বোধ হয়, আমাকে শতসহস্র বৃশ্চিকে দংশন করে—শিরায় শিরায় আগুন জ্বলে। আমি তাঁহার যোগ্যা নহি বলিয়া, আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হইয়াছে? তিনি কি দুঃখ করিয়াছেন? না—আমি তাহার কেহ নহি। পুঁথিই তাঁহার সব। তিনি আমার জন্য দুঃখ করিবেন না।

একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি আমাকে কেহ আসিয়া বলে—তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন। তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই—কখনও ভালবাসিতে পারিব না—তথাপি তাঁহার মনে যদি কোন ক্লেশ দিয়া থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হইল। আর একটি কথা তাঁহাকে বলিতে সাধ করে,—কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?"

শৈবলিনী শয়ন করিল। শয়ন করিয়া সেইরূপ চিন্তাভিভূত রহিল। প্রভাতকালে তাহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কু-স্বপ্ন দেখিল। যখন তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—মুক্ত গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করিয়াছে। শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইল। দেখিল—চন্দ্রশেখর।

তৃতীয় খণ্ড

পুণ্যের স্পর্শ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে একজন পরমহংস কিয়দ্দিবস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীতভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন-বিজ্ঞান সকল তিনিই জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চির-দুঃখী বলিতে হয়।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নল রাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সার্ব্বভৌম মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চির-দুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। দানবপীড়িত অভিশপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ। শেষে মনোমোহিনী বাক্‌শক্তির দৈবাবতারণা করিয়া অনন্ত অপরিজ্ঞেয় বিধাতৃহৃদয়মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখাইলেন যে যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই দুঃখময় অনন্ত সংসারে অনন্ত দুঃখরাশি অনাদি অনন্তকালাবধি হৃদয়মধ্যে অবশ্য অনুভূত করেন। যিনি দয়াময়, তিনি কি সেই দুঃখ-রাশি অনুভূত করিয়া দুঃখিত হন না? তবে দয়াময় কিসে? দুঃখের সঙ্গে দয়ার নিত্য সম্বন্ধ—দুঃখ না হইলে দয়ার সঞ্চার কোথায়? যিনি দয়াময়, তিনি অনন্ত সংসারের অনন্ত দুঃখে অনন্তকাল দুঃখী—নচেৎ তিনি দয়াময় নহেন। যদি বল, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার দুঃখ কি? উত্তর এই যে, যিনি নির্ব্বিকার তিনি সৃষ্টি-স্থিতিসংহারে স্পৃহাশূন্য—তাঁহাকে স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া মানি না। যদি কেহ স্রষ্টা বিধাতা থাকেন, তবে তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলিতে পারি না। তিনি দুঃখময়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কেন না তিনি নিত্যানন্দ। অতএব দুঃখ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সিদ্ধ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার কর, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই; তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ হইতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখ-নিবৃত্তিতে ঐশিক দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদির বিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা কীর্ত্তন করিয়া ভীষ্মাদি বীরগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে। তখন রমানন্দ স্বামী শতমুখে পরোপকার-ধর্ম্মের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণেতিহাস প্রভৃতি মন্থন করিয়া অনর্গল ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রযুক্ত করিতে লাগিলেন। শব্দসাগর মন্থন করিয়া শত শত মহার্ঘ, শ্রবণ-মনোহর বাক্য-পরম্পরা কুসুমমালাবৎ গ্রন্থন করিতে লাগিলেন—সাহিত্য-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সারবতী, রসপূর্ণা, সদলঙ্কারবিশিষ্টা কবিতানিচয় বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বোপরি আপনার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের মোহময়ী প্রতিভান্বিতা ছায়া বিস্তারিত করিলেন। তাঁহার সুকণ্ঠ-নির্গত, উচ্চারণ-কৌশলযুক্ত সেই অপূর্ব্ব বাক্য সকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সে বাক্য সকল কখনও মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখন বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদ-রেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে ব্রহ্মচারীদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেশ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্‌সমকে লইয়া যাইবার জন্ত প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিল, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। কবিগণ আশার প্রশংসায় মুগ্ধ হন। আশা সংসারের অনেক সুখের কারণ বটে, কিন্তু আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়। কেবল সৎকার্য্য কোন আশায় কৃত হয় না। যাঁহারা স্বর্গের আশায় সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদের কার্য্যকে সৎকার্য্য বলিতে পারি না। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী আপত্তি না করিয়া, শিবিকারোহণ করিল।

খোজা শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত দলনী নহে। আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে। আরও দেখিলেন যে, এরূপ লোকবিমোহিনী তাঁহার অন্তঃপুরে কেহ নাই।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈব। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের গৃহ হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিল। তাঁহারা কে, তাহা জানিত না। মনে করিয়াছিল, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু যখন নবাবের ভৃত্য তাহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল এবং তাহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিল যে, বেগমকে ইংরেজরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী ভাবিতেছিল।

নবাব শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে?

শৈ। যেখানে আমরা কা'ল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায়? প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈ। আজ্ঞে হাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন জান?

শৈ। দুইজন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিল। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। অধর দংশন করিয়া শ্মশ্রু উৎপাটন করিলেন। গুর্‌গন্ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, ইংরেজ বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জান?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈ। তাঁহাকে উহারা সেই সঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে জান?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলিল, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারের চাকরী করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিল। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিল, "আমার গৃহ কোথা—কোথা যাইব।"

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন, পরক্ষণে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয় আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন, যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব, সেইজন্য এখানে আসিয়াছি।

সংবাদ আসিল, গুর্‌গন্ খাঁ হাজির। নবাব শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন সখ

নবাব গুর্‌গন্ খাঁকে অন্যান্য সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল?"

গুর্‌গন্‌ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে—আর—"

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহরমধ্যে একব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্। এত্তেলা দিবার জন্য হে নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়ন্দার ইংরেজকে কে কা'ল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেইজন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে, শুনিয়াছ?

গুর্। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, কি আজিনাবাদ পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব। এতক্ষণ আমাকে এ সকল সংবাদ দাও নাই কেন?

গুর্। আমি এইমাত্র শুনিলাম।

এই কথাটি মিথ্যা। গুর্‌গন্‌ খাঁ আদ্যোপান্ত সকল জানিতেন, তাঁহার অনভিমতে আমিয়ট কদাপি মুঙ্গের ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গুর্‌গন্‌ খাঁর দুইটি উদ্দেশ্য ছিল,—প্রথম, দলনী মুঙ্গেরের বাহির হইলেই ভাল; দ্বিতীয়, আমিয়ট একটু হস্তগত থাকা ভাল; ভবিষ্যতে তাহার দ্বারা উপকার ঘটিতে পারিবে।

নবাব গুর্‌গন্‌ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্‌গন্‌ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি

বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই—"যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, তত দিন তোমায় কিছু বলিব না—যুদ্ধকালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তারপর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, "মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরওয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে এবং তাঁহার সঙ্গের বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া কলে-কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দিও। পরওয়ানা তটপথে বাহকের হাতে যাউক, অগ্রে পঁহুছিবে।"

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না। ইংরেজরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত যোড় করিয়া কহিল, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে ধরা যায় না কি?"

নবাব। ইংরাজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে বড় নৌকা চাই। ধরিতে ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদে পৌঁছিবে। বিশেষ যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া কি জানি, যদি ইংরেজরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে; মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে-কৌশলে ধরিবে।

শৈবলিনী বুঝিল যে, তাহার সুন্দর মুখখানিতে অনেক উপকার হইয়াছে। নবাব তাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া তাহার সকল কথা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করিতেছেন। নহিলে এত কথা বুঝাইয়া বলিবেন কেন? শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাতযোড় করিল। বলিল, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে, তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না; তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না; যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকে মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন ; বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি তাহা জান না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে ?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। বলিল, "প্রভু! না পারি, আমি মরিব—তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি পারি তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত-ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন এ সামান্যা স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি ? যদি পারে ভালই, নহিলে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধি করিবে। শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে ?"

শৈ। স্ত্রীলোক একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী, একজন রক্ষক, আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দিন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও এবং একজন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া এইক্ষণেই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দিন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য উদ্ধার করিতে হইবে ?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া দেখিয়া, সেইরূপ মাটী ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিল। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও, কখনও যদি মুস্কিলে পড়, তবে মীর কাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিল। মনে মনে বলিল, "আসিব বৈ কি! হয় ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী লইয়া দরবার করিবার জন্য তোমার কাছে আসিব।" মসীবুদ্দিন পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলী, বারুদ, পিস্তল, তরবারি ও ছুরি সংগ্রহ করিল। মসীবুদ্দিন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে

পারিল না যে, এ সকল কি হইবে? মনে মনে কহিল যে, এ দোসরা চাঁদ স্থলতানা।

সেই রাত্রে তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। গঙ্গার দুইপার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতা শ্রেণী অধিকতর ধবল-শ্রী ধরিয়াছে; গঙ্গার জল চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘনশ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতিজ্ঞানে কখনও কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত, যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট-দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকাভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত। তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে যে বালুকাভূমে তরণীশ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণীশ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয় গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে স্নিগ্ধ স্ফটিকদীপের আলোকে নানাবিধ মহার্ঘ্য আসন, শয্যা, চিত্র, পুত্তল প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। ভিতরে কয়জন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন। একজন সুরাপান করিতেছেন ও পড়িতেছেন। একজন বাদ্যবাদন করিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরব বিদীর্ণ করিয়া সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল।

আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে, কিন্তু সেই জলভূমির নীরব প্রান্তর-মধ্যে এই নিশীথক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন।

কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তর-মধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট পুনঃপুনঃ তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—পাপিষ্ঠা শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ষ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না. তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ষ্টন্‌ও প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজমহলে হিন্দীতে তাঁহার বড় পসার। গল্‌ষ্টন্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিল না—কাঁদিতে লাগিল।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ষ্টন্ হারি মানিলেন। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজরা

শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে কথাও বুঝিল না—নড়িল না—দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙ্গালীর মেয়ে; একজন বাঙ্গালীকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিল। খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল"।

সাহেবরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল; শৈবলিনী বলিল, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চ্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল; হৃষ্টচিত্তে, কেন না, শৈবলিনী পরমা সুন্দরী। শৈবলিনী কিছুই খাইল না। খানসামা বলিল, "খাও না।" শৈবলিনী বলিল, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে, দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা যে নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ কয়েদী প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পানসীতে একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে, পিছে শাস্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ও গো ঠাকুর!"

প্রতাপ বলিল, "কেন?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?

প্র। কেন?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে, ছুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বল।"

খানসামা শাস্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। শাস্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল। পরের জন্য এত জল-বেড়াবেড়ি কে করে? বিশেষ পীরবক্স সাহেবের খানসামা, কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক পরের উপকার করে না। পৃথিবীতে যত প্রকার মনুষ্য আছে, ইংরেজদিগের মুসলমান খানসামা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু এখানে পীরবক্সের একটু স্বার্থ ছিল। সে মনে করিয়াছিল, এ স্ত্রীলোকটার খাওয়া-দাওয়া হইলে ইহাকে একবার খানসামা মহলে লইয়া গিয়া বসাইব। পীরবক্স শৈবলিনীকে আহার করাইয়া বাধ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। প্রতাপের নৌকায় শৈবলিনী বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল—খানসামা হুকুম করাইতে আমিয়ট সাহেবের নিকট গেল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। বিশেষ সুন্দর মুখের অধিকারী যদি যুবতী স্ত্রী হয়, তবে সে মুখ অমোঘ অস্ত্র; আমিয়ট দেখিয়াছিলেন যে, এই "জেণ্টু" স্ত্রীলোকটি নিরুপমা রূপবতী—তাহাতে আবার পাগল শুনিয়া একটু দয়াও হইয়াছিল। আমিয়ট জমাদ্দার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। শাস্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতর প্রবেশ করিল। শাস্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে দেখিলেন, শৈবলিনী অধর দংশন করিতেছে, মুখ ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল, মুখমণ্ডল স্থির-প্রতিজ্ঞার চিহ্নযুক্ত। প্রতাপ মানিল, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে।

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে কানে বলিল, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইল। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে কানে বলিল, "এখন পলাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্ম।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিল, "আগে তুমি যাও। নচেৎ তুমি বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এই বেলা পলাও। হাতকড়ি দিলে আর পলাইতে পারিবে না। এই বেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চল, আমি পাগল, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্ম জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইয়া বলিল, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও।" বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার শ্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

"কি হইল ? কি হইল ?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে করিতে নৌকা হইতে বাহির হইলেন। শাস্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী হইতে পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপর দিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। প্রতাপ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তরণ কাটিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতে শাস্ত্রী ডাকিল এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পলাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব —সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি প্রকারে দেখিব ? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।"

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিল। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। দেখিল যে নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিল, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিত হইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল তাহার ছাদে জ্যোৎস্নার আলোকে ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়নাবস্থায় রহিয়াছে। উজ্জ্বল চন্দ্ররশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার

শব্দ করিল—দেখিল, পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর। লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে চিনিল—শৈবলিনী। লরেন্স ফষ্টরও চীৎকার করিয়া বলিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! হামারা বিবি!" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে। তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাকড়ো! পাকড়ো! ফষ্টর সাহেব ইনাম দেগা।" প্রতাপ মনে মনে বলিল, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে, আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিল, "আমি ধরিতেছি, তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ।৷ ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে সাঁতার

দুইজনে সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল। কি মনোহর দৃশ্য! কি সুখের সাগরে সাঁতার! এই অনন্তদেশব্যাপিনী বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্রবীচিমালিনী নীলিমাময়ী তটিনীর বক্ষে, চন্দ্রকর-সাগরমধ্যে ভাসিতে ভাসিতে সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্তনীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল; তখন প্রতাপ মনে করিল, কেনই বা মনুষ্য-অদৃষ্টে ঐ সমুদ্রে সাঁতার নাই? কেনই বা মানুষে ঐ মেঘের তরঙ্গ ভাঙ্গিতে পারে না? কি পুণ্য করিলে ঐ সমুদ্রে সন্তরণকারী জীব হইতে পারি? সাঁতার? কি ছার ক্ষুদ্র পার্থিব নদীতে সাঁতার! জন্মিয়া অবধি এই দুরন্ত কাল সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, তরঙ্গ ঠেলিয়া তরঙ্গের উপর ফেলিতেছি—তৃণবৎ তরঙ্গে তরঙ্গে বেড়াইতেছি—আবার সাঁতার কি? শৈবলিনী ভাবিল, এ জলের ত তল আছে—আমি যে অতল জলে ভাসিতেছি।

তুমি গ্রাহ্য কর, না কর, তাই বলিয়া ত জড়প্রকৃতি ছাড়ে না—সৌন্দর্য্য ত লুকাইয়া রয় না। তুমি যে সমুদ্রে সাঁতার দাও না কেন, জল নীলিমার মাধুর্য্য বিকৃত হয় না—ক্ষুদ্র বীচির মালা ছিঁড়ে না,—তারা তেমনি জলে—তীরে বৃক্ষ তেমনই দোলে—জলে চাঁদের আলো তেমনই খেলে। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য! স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সকল সময়েই আদর করিতে চায়।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে। শৈবলিনী নৌকার

উপর যে রুগ্ন, শীর্ণ, শ্বেত মুখমণ্ডল দেখিয়াছিল, তাহার মনে কেবল তাহাই জাগিতেছিল। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিল। কিন্তু শ্রান্তি নাই। উভয়ে সন্তরণ-পটু। সন্তরণে প্রতাপের আনন্দ-সাগর উছলিয়া উঠিতেছিল।

প্রতাপ ডাকিল, "শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিল—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাহাকে "শৈ" বা "সই" বলিয়া ডাকিত। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিল। কতকাল পরে! বৎসরে কি কালের মাপ! ভাবে ও অভাবে কালের মাপ। শৈবলিনী যত বৎসর সই শব্দ শুনে নাই, শৈবলিনীর সেই এক মন্বন্তর। এখন শুনিয়া শৈবলিনী সেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চক্ষু মুদিল। মনে মনে চন্দ্রতারাকে সাক্ষী করিল। চক্ষু মুদিয়া বলিল, "প্রতাপ! আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?"

প্রতাপ বলিল, "চাঁদের? না। সূর্য্য উঠিয়াছে।—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চল তীরে উঠি।

প্র। শৈ!

শৈ। কি?

প্র। মনে পড়ে?

শৈ। কি?

প্র। আর একদিন এমনই সাঁতার দিয়াছিলাম।

শৈবলিনী উত্তর দিল না। একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল; শৈবলিনী তাহা ধরিল। প্রতাপকে বলিল, "ধর, ভর সহিবে! বিশ্রাম কর।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিল। বলিল, "মনে পড়ে? তুমি ডুবিতে পারিলে না—আমি ডুবিলাম?" শৈবলিনী বলিল, "মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে তবে আজ তার শোধ দিতাম। কেন ডাকিলে?"

প্র। তবে মনে আছে যে, আমি মনে করিলে ডুবিতে পারি?

শৈবলিনী শঙ্কিতা হইয়া বলিল, "কেন প্রতাপ? চল তীরে উঠি।"

প্র। আমি উঠিব না। আজি মরিব।

প্রতাপ কাষ্ঠ ছাড়িল।

শৈ। কেন, প্রতাপ?

প্র। তামাসা নয়—নিশ্চিত ডুবিব—তোমার হাত।

শৈ। কি চাও, প্রতাপ? যা বল, তাই করিব।

প্র। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ, প্রতাপ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল। চন্দ্র কপিশবর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন সম্মুখে তরবারিহস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল, "কি শপথ, প্রতাপ?"

উভয়ে পাশাপাশি কাষ্ঠ ছাড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। গঙ্গার কলকল চলচল জলভঙ্গরবমধ্যে এই ভয়ঙ্কর কথা হইতেছিল। চারিপাশে প্রক্ষিপ্ত বারিকণা-মধ্যে চন্দ্র হাসিতেছিল। জড়প্রকৃতির দৌরাত্ম্য!

"কি শপথ, প্রতাপ?"

প্র। এই গঙ্গার জলে—

শৈ। আমার গঙ্গা কি?

প্র। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বল—

শৈ। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্র। তবে আমার শপথ?

শৈ। কাছে আইস—হাত দাও।

প্রতাপ নিকটে গিয়া, বহুকাল পরে শৈবলিনীর হাত ধরিল। দুইজনের সাঁতার দেওয়া ভার হইল। আবার উভয়ে কাষ্ঠ ধরিল।

শৈবলিনী বলিল, "এখন যে কথা বল, শপথ করিয়া বলিতে পারি—কতকাল পরে প্রতাপ?"

প্র। আমার শপথ কর, নহিলে ডুবিব। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ করিয়া এ পাপ জীবনের ভার সহিতে চায়। চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে যদি এ বোঝা নামাইতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

উপরে চন্দ্র হাসিতেছিল।

শৈবলিনী বলিল, "তোমার শপথ—কি বলিব?"

প্র। শপথ কর,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ কর—আমার মরণ বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিল। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ, তাহার পালন অসাধ্য, প্রাণান্তকর; শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না; বলিল—"এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?"

প্র। আমি!

শৈ। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে—বল আছে—কীর্ত্তি আছে—বন্ধু আছে—ভরসা আছে—রূপসী আছে—আমার কি আছে প্রতাপ?

প্র। কিছু না—আইস, তবে দুইজনে ডুবি।

শৈবলিনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। চিন্তার ফলে, তাহার জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। "আমি মরি তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?" প্রকাশ্যে বলিল, "তীরে চল।"

প্রতাপ অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ডুবিল।

তখনও প্রতাপের হাতে শৈবলিনীর হাত ছিল, শৈবলিনী টানিল। প্রতাপ উঠিল।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাই না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব?

প্রতাপ হাত ছাড়িল। শৈবলিনী আবার ধরিল। তখন অতি গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিল—বলিল,—"প্রতাপ, হাত চাপিয়া ধর। প্রতাপ, শুন, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ। আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতে আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিল—কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিল।

প্রতাপ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "চল, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিল।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিল। ছিপ নিকটে ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিল। উভয়ের মধ্যে কেহ জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল; কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

রূপসীর সঙ্গে মোকদ্দমায় আরজি পেশ না হইতেই শৈবলিনীর হার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইল, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না। তাহারই গুলিতে যে ফষ্টরের আঘাত ও সাস্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মনিব বড় বদ্‌জাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে বলায় বুঝায় যে, আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি এক প্রকার এদেশী খোশামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোশামোদ করিয়া, "মা বাপ" "ভাই" এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোশামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কিছু দিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব।"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিল, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না

বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে রামচরণ অস্ফুট স্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতোপরি

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ, ছিদ্রশূন্য, অনন্তবিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার; গাঢ়, অনন্ত, সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার; তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে; সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে ছিপ পশ্চাদ্ধাবিত ইংরেজদিগের অনুচরদিগকে দূরে রাখিয়া, তীরে লাগিযাছিল—বড় বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেই সময়ে, শৈবলিনী, অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিল। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করে নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। প্রাণভয়ে শৈবলিনী সুখ সৌন্দর্য্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই—আকাঙ্ক্ষাও পরিহার্য্য—নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে? মরুভূমে থাকিলে, কোন্ তৃষিত পথিক, সুশীতল স্বচ্ছ সুবাসিত বারি দেখিয়া পান না করিয়া থাকিতে পারে? ভিক্টর হ্যুগো যে সমুদ্রতলবাসী রাক্ষসস্বভাব ভয়ঙ্কর পুরুভুজের বর্ণনা করিয়াছেন, লোভ বা আকাঙ্ক্ষাকে সেই জীবের স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। ইহা অতি স্বচ্ছ স্ফটিকনিৰ্ম্মিত জলমধ্যে বাস করে, ইহার বাসগৃহতলে মৃদুল জ্যোতিঃ-প্রফুল্ল চারু গৈরিকাদি ঈষৎ জ্বলিতে থাকে, ইহার গৃহে কত মহামূল্য মুক্তা-প্রবালাদি কিরণ প্রচার করে; কিন্তু ইহা মনুষ্যের শোণিত পান করে; যে ইহার গৃহসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তথায় গমন করে, এই শতবাহু রাক্ষস, ক্রমে এক একটি হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে ধরে; ধরিলে আর কেহ ছাড়াইতে পারে

না। শত হস্তে সহস্র গ্রন্থিতে জড়াইয়া ধরে ; তখন রাক্ষস, শোণিতশোষক সহস্র মুখ হতভাগ্য মনুষ্যের অঙ্গে স্থাপন করিয়া তাহার শোণিত শোষণ করিতে থাকে।

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। মনে তাহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই, তাহার সন্ধান করিবে। এ জন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিল, ততদূর চলিল। ভারতবর্ষের কটিবন্ধস্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইল। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে, অনুসন্ধানপ্রবৃত্ত কেহ তাহাতে দেখিতে পায়, এ জন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত হইল না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল। সমস্ত দিন অনাহারে গেল। সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে, গিরি আরোহণ আরম্ভ করিল। অন্ধকারে শিলাখণ্ডসকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র লতা-গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না ; তাহার কণ্টকে ভগ্ন শাখাগ্র-ভাগের, বা মূলাবশেষের অগ্রভাগে, হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া, এ ভীষণ কণ্টকময়, হিংস্রকজন্তুপরিবৃত পার্ব্বত্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এত কাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে ?

অতএব ক্ষতবিক্ষতচরণে, শোণিতাক্ত কলেবরে, ক্ষুধার্ত্ত পিপাসাপীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি আরোহণ করিতে লাগিল। পথ নাই—লতাগুল্ম এবং শিলারাশির মধ্যে দিনেও পথ পাওয়া যায় না—এক্ষণে অন্ধকার। অতএব শৈবলিনী বহু কষ্টে অল্পদূরে মাত্র আরোহণ করিল।

এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদশূন্য, অনন্তবিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল, জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক, এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা—শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিল।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। অতি ভয়ঙ্কর। সঙ্গে সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল। শৈবলিনী বুঝিল, বিষম নৈদাঘ বাত্যা সেই অদ্রিসানুদেশে প্রধাবিত হইবে। ক্ষতি কি? এই পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অনেক বৃক্ষ, শাখা, পত্র, পুষ্পাদি স্থানচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে—শৈবলিনীর কপালে কি সে সুখ ঘটিবে না?

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তার পর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে গর্জ্জন বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে, শৈবলিনা বসিয়া—মাথার উপরে শীতল জলরাশি বর্ষণ হইতেছে। অঙ্গের উপর বৃক্ষ লতা গুল্মাদির শাখা সকল বায়ুতাড়িত হইয়া প্রহৃত হইতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার প্রহৃত হইতেছে। শিখরাভিমুখ হইতে জলপ্রবাহ বিষম বেগে আসিয়া শৈবলিনীর উরুদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছুটিতেছে।

তুমি জড়প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী নানারূপরঙ্গিণি! কালি তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্রকিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া ভুবন মোহিয়াছ। গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাতে কত সুখে যুবক যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে! যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে! আজি এ কি? তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই—কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী; তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি কোটি প্রণাম।

অনেক পরে বৃষ্টি থামিল—ঝড় থামিল না। কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র—অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল। শৈবলিনী বুঝিল যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে

লাগিল। তখন তাহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমন সময় সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে সেই মহাঘোর অন্ধকারে, কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিল, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিল। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্যহস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "তুমি কে? দেবতা না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেন না দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিল। দেখিল, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্রিত করিয়া বেড়িয়া ধড়িল। শৈবলিনী দেখিল, তাহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিল—বুঝিল যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিল যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ কি করিলেন

প্রতাপ জমীদার, এবং প্রতাপ দস্যু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমীদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বপুরুষগণের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয়, কোন জমীদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না; কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশমর্য্যাদায় পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন; ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশমর্য্যাদার বিশেষ গর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা নর্ম্মান বা স্কন্দেনেবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশেরই বিশেষ মর্য্যাদা ছিল; তাঁহারা গোচোর; বিরাটের উত্তরগোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালী জমীদারের এরূপ কিঞ্চিৎ বংশমর্য্যাদা আছে।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমীদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইল, সেই রাত্রি প্রভাতে প্রতাপ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন; কিছুকাল তাহার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহাকে না দেখিয়া, তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। অনেক বেলা হইল। প্রতাপ নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে,

শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাঁহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি। আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্মপথে যাই নাই। শৈবলিনী যে জন্য মরিয়াছে, তাহা আমার নিবার্য্য কারণ নহে।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। চন্দ্রশেখরের উপর কিছু রাগ করিলেন—চন্দ্রশেখর কেন শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়াছিল? রূপসীর উপর একটু রাগ করিলেন, কেন শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ না হইয়া, রূপসীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল? সুন্দরীর উপর আরও একটু রাগ করিলেন—সুন্দরী তাঁহাকে না পাঠাইলে, প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর গঙ্গাসন্তরণ ঘটিত না, শৈবলিনীও মরিত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ জাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজ জাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটী ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাঙ্গালা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য; কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গেরে ফিরিয়া গেলন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না?

তার পর মনে ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এই কার্য্যে নবাবের সাহায্য করে। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তার পর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না? আমি কি করিতে পারি?

তার পর মনে ভাবিলেন, আমার সৈন্য নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে—দস্যু আছে। তাহাদিগের দ্বারা কোন্ কার্য্য হইতে পারে?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুঠপাট হইতে পারে। যে গ্রামে ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের

রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানেই রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্যসামগ্রী যাইতেছে, সেইখানেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায়মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর তাহা করিব।

তার পর ভাবিলেন, আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখান বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব। অতএব আমি ইহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোশামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইল, তাহা অপ্রকাশ রহিল। নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশ আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু রূপসী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুঃখিত হইল। প্রতাপ আসিয়াছে শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিল। সুন্দরী শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল, কিন্তু বলিল, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে। কিন্তু শৈবলিনী এখন সুখী হইল। তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই যে সুখের, তাহা আর কোন্ মুখে না বলিব?"

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন, অচিরাৎ দেশে দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছে।

শুনিয়া গুর্‌গন্‌ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী কি করিল

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহায়—পৃষ্ঠচ্ছেদী উপলশয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ, শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু

গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ। নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলেই তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্রপথে বিন্দু বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া, ক্ষণে ক্ষণে টিপ টাপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু—কে জানে?—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইল। ভয়? তাহাও নহে। মনুষ্যের স্থিরবুদ্ধিতার সীমা আছে—শৈবলিনী সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। শৈবলিনীর ভয় নাই—কেন না, জীবন তাহাব পক্ষে অবহনীয় ভার হইয়া উঠিয়াছিল—ফেলিতে পারিলেই ভাল। বাকী যাহা—সুখ, ধর্ম্ম, জাতি, কুল, মান, সকলই গিয়াছে—আর যাইবে কি? কিসের ভয়?

কিন্তু শৈবলিনী আশৈশব, চিরকাল যে আশা হৃদয়মধ্যে সযত্নে, সঙ্গোপনে পালিত করিয়াছিল, সেই দিন বা তাহার পূর্ব্বেই, তাহার উচ্ছেদ করিয়াছিল; যাহার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও ত্যাগ করিয়াছে; চিত্ত নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। আবার প্রায় দুই দিন অনশন, তাহাতে পথশ্রান্তি, পর্ব্বতারোহণ-শ্রান্তি; বাত্যাবৃষ্টিজনিত পীড়াভোগ; শরীরও নিতান্ত বিকল, নিতান্ত বলশূন্য। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানবচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, মন ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থায় রহিল। গুহাতলস্থ উপলখণ্ড সকলে পৃষ্ঠদেশ ব্যথিত হইতেছিল।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে শৈবলিনী দেখিল, সম্মুখে এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুই কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোতঃ বহিতেছে। তাহাতে অস্থি-গলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল—চর্ম্মমাংসাদি-বর্জ্জিত—কেবল অস্থি ও বৃহৎ, ভীষণ, উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয়বিশিষ্ট—ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই সকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিল যে, যে মহাকায় পুরুষ তাহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, সেই আবার তাহাকে ধৃত করিয়া সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইল। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোক মাত্র নাই, অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, স্রোতোবাহিত কঙ্কালমালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ, সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। নদীতীরে বালুকা নাই—তৎপরিবর্ত্তে লৌহসূচী সকল অগ্রভাগ উর্দ্ধ

করিয়া রহিয়াছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায়, প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্। শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি প্রকারে সাঁতার দিবে? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিল যে, সেই বেত্র জলন্ত লোহিত লৌহনির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া, মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিল। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর সকল তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্তু ধরিল না। শৈবলিনী সাঁতার দিয়া চলিল; রুধিরস্রোতঃ বদনমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। মহাকায় পুরুষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে রুধিরস্রোতের উপর দিয়া পদব্রজে চলিলেন—ডুবিলেন না। মধ্যে মধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট গলিত শব ভাসিয়া আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রে লাগিতে লাগিল। এইরূপে শৈবলিনী পরপারে উপস্থিত হইল; সেখানে কূলে উঠিয়া চাহিয়া দেখিয়া, "রক্ষা কর! রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহার সীমা নাই, আকার নাই, বর্ণ নাই, নাম নাই। তথায় আলোক অতি ক্ষীণ, কিন্তু এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, তাহা চক্ষে প্রবেশমাত্র শৈবলিনীর চক্ষু বিদীর্ণ হইতে লাগিল—বিষসংযোগে যেরূপ জ্বালা সম্ভব, চক্ষে সেইরূপ জ্বালা ধরিল। নাসিকায় এরূপ ভয়ানক পূতিগন্ধ প্রবেশ করিল যে, শৈবলিনী নাসিকা আবৃত করিয়াও উন্মত্তার ন্যায় হইল। কর্ণে, অতি কঠোর, কর্কশ, ভয়াবহ শব্দ সকল এককালে প্রবেশ করিতে লাগিল—হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ, পৈশাচিক হাস্য, বিকট হুঙ্কার, পর্ব্বতবিদারণ, অশনিপতন, শিলাঘর্ষণ, জলকল্লোল, অগ্নিগর্জ্জন, মুমূর্ষুর ক্রন্দন সকলই এককালে শ্রবণ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্মুখ হইতে ক্ষণে ক্ষণে ভীমনাদে এরূপ প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈবলিনীকে অগ্নিশিখার ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। কখনও বা শীতে শতসহস্র ছুরিকাঘাতের ন্যায় অঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। শৈবলিনী ডাকিতে লাগিল, "প্রাণ যায়! রক্ষা কর!" তখন অসহ্য পূতিগন্ধবিশিষ্ট এক বৃহৎ কদর্য্য কীট আসিয়া শৈবলিনীর মুখে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৈবলিনা তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "রক্ষা কর! এ নরক! এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।" স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে।

শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিল, "আমার কি হবে! আমার উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিল, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর—আমি শিখাইব।

শৈ—তুমি কে?

উত্তর—ব্রত গ্রহণ কর।

শৈ—কি করিব?

উত্তর—তোমার ও চীরবাস ত্যাগ করিয়া, আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইল। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি করিব?"

উত্তর—তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈ। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর—হাঁ—গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—ফলমূলপত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈ। আর?

উত্তর—জটাধারণ করিবে।

শৈ। আর?

উত্তর—একবারমাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থ প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈ। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই?

উত্তর—আছে।

শৈ। কি?

উত্তর—মরণ।

শৈ। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইল না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি যেই হউন, জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায়?"

উত্তর—কেন?

শৈ। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না?

উত্তর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈ। দ্বাদশ বৎসর পরে?

উত্তর—দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈ। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কত দিন বাঁচিব? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই?

উত্তর—তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈ। কোন উপায়ে কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর—যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ, দিনরাত্র কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন, কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না বা কাহারও নিকট সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি এই অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, সরলচিত্তে অবিরত অনন্তমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিল—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইল না—কেবল এক একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইত। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিল না। প্রায় অনশনে, সেই বিকটান্ধকারে অনন্যেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিল—কিছু দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু স্পর্শ করিতে পায় না। ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ—মন নিরুদ্ধ—সর্ব্বত্র স্বামী। স্বামী চিত্তবৃত্তিসমূহের একমাত্র অবলম্বন হইল। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পায় না—সাত দিন সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিল। ভীম নীরবে আর কিছু শুনিতে পায় না—কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহ-বিচলিত, বাক্যালাপ শুনিতে পাইল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবলমাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্প-রাশির গন্ধ পাইতে লাগিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভূত করিতে লাগিল। আশা আর কিছুতে নাই—আর কিছুতে ছিল না, স্বামিসন্দর্শনকামনাতেই রহিল। স্মৃতি কেবল শ্মশ্রুশোভিত, প্রশস্তললাটপ্রমুখ বদনমণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল—কণ্টকে ছিন্নপক্ষ ভ্রমরী যেমন দুর্লভ সুগন্ধিপুষ্পবৃক্ষতলে কষ্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, তেমনই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল, সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী, সন্দেহ নাই। নির্জ্জন, নীরব, অন্ধকার, মনুষ্যসন্দর্শনরহিত, তাহাতে আবার শরীর ক্লিষ্ট, ক্ষুধাপীড়িত; চিত্ত অন্যচিন্তাশূন্য; এমন সময়ে যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় অবসন্ন শরীরের অবসন্ন মনে, একাগ্রচিত্তে, স্বামীর ধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

বিকৃতি? না দিব্যচক্ষু? শৈবলিনী দেখিল—অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে দিব্যচক্ষু চাহিয়া শৈবলিনী দেখিল, এ কি রূপ! এই দীর্ঘ শালতরুনিন্দিত, সুভুজ-বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময় এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট—প্রশস্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, চিন্তারেখা-বিশিষ্ট—এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন—জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্র জ্যোতিঃ স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎ রঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম, কেন মজিলাম—কেন মরিলাম? এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ

চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়—আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া—আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিষ্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গরঞ্জিত, স্নেহপরিপ্লুত, মৃদু, মধুর, পরিশুদ্ধ—কিসের প্রতাপ? কেন মজিলাম—কেন মরিলাম—কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্নতুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য—অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কূলপ্লাবী, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খাইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্য—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?

যে বলিয়াছিল, এইরূপে স্বামিধ্যান কর, সে অনন্ত মানবহৃদয়-সমুদ্রের কাণ্ডারী—সব জানে। জানে যে, এই মন্ত্রে চিরপ্রবাহিত নদী অন্য খাদে চালান যায়,—জানে যে, এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙ্গিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিল।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ,—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফলমূল খাইল না—ষষ্ঠ দিবসে ফলমূল আহরণে গেল না—সপ্তম দিবস প্রাতে ভাবিল, স্বামিদর্শন পাই না পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিল, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন; শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুণগুণ করিতেছে।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামিধ্যান করিতে করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইল। সে নানা বিষম স্বপ্ন দেখিতে

লাগিল। কখন দেখিল, সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত, শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে, সকলের মিলিত নিশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে, চন্দ্রশেখর আসিয়া এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে। আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্ব্বতমধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে স্বচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকসিত হইল, নদীজলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ভিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, শৈবলিনী দেখিল, তাহার মুখ ফষ্টরের মুখের ন্যায়।

রাত্রিশেষে শৈবলিনী দেখিলেন, শৈবলিনীর মৃত্যু হইয়াছে অথচ জ্ঞান আছে। দেখিলেন, পিশাচে তাহার দেহ লইয়া অন্ধকারে শূন্যপথে উড়িতেছে। দেখিলেন, কত কৃষ্ণমেঘের সমুদ্র, কত বিদ্যুদগ্নিরাশি পার হইয়া তাহার কেশ ধরিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। কত গগনবাসী অপ্সরা কিন্নরাদি মেঘতরঙ্গ মধ্য হইতে মুখমণ্ডল উত্থিত করিয়া, শৈবলিনীকে দেখিয়া হাসিতেছে। দেখিলেন, কত গগনচারিণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী স্বর্ণ-মেঘে আরোহণ করিয়া, স্বর্ণকলেবর বিদ্যুতের মালায় ভূষিত করিয়া, কৃষ্ণকেশাবৃত ললাটে তারার মালা গ্রথিত করিয়া বেড়াইতেছে,—শৈবলিনীর পাপময় দেহস্পৃষ্ট পবনস্পর্শে তাহাদের জ্যোতিঃ নিবিয়া যাইতেছে। কত গগনচারিণী ভৈরবী রাক্ষসী, অন্ধকারবৎ শরীর প্রকাণ্ড অন্ধকার মেঘের উপর হেলাইয়া ভীম বাত্যায় ঘুরিয়া ক্রীড়া করিতেছে,—শৈবলিনীর পূতিগন্ধবিশিষ্ট মৃতদেহ দেখিয়া তাহাদের মুখে জল পড়িতেছে, তাহারা হাঁ করিয়া আহার করিতে আসিতেছে। দেখিলেন, কত দেব দেবীর বিমানের, কৃষ্ণতাশূন্যা উজ্জ্বলালোকময়ী ছায়া মেঘের উপর পড়িয়াছে; পাছে পাপিষ্ঠা শৈবলিনীশবের ছায়া বিমানের পবিত্র ছায়ায় লাগিলে শৈবলিনীর পাপক্ষয় হয়, এই ভয়ে তাঁহারা বিমান সরাইয়া লইতেছেন। দেখিলেন, নক্ষত্রসুন্দরীগণ নীলাম্বরমধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখগুলি বাহির করিয়া সকলে

কিরণময় অঙ্গুলির দ্বারা পরস্পরকে শৈবলিনীর শব দেখাইতেছে—বলিতেছে—'দেখ, ভগিনি, দেখ, মনুষ্য-কীটের মধ্যে আবার অসতী আছে!' কোন তারা শিহরিয়া চক্ষু বুজিতেছে; কোন তারা লজ্জায় মেঘে মুখ ঢাকিতেছে; কোন তারা অসতীর নাম শুনিয়া ভয়ে নিবিয়া যাইতেছে। পিশাচেরা শৈবলিনীকে লইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, তারপর আরও ঊর্দ্ধে, আরও মেঘ, আরও তারা পার হইয়া আরও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া সেইখান হইতে শৈবলিনীর দেহ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে বলিয়া উঠিতেছে। যেখানে উঠিল, সেখানে অন্ধকার, শীত,—মেঘ নাই, তারা নাই, আলো নাই, বায়ু নাই, শব্দ নাই। শব্দ নাই—কিন্তু অকস্মাৎ অতি দূরে অধঃ হইতে অতি ভীম কলকল ঘরঘর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল—যেন অতিদূরে, অধোভাগে, শত সহস্র সমুদ্র এককালে গর্জ্জিতেছে। পিশাচেরা বলিল, "ঐ নরকের কোলাহল শুনা যাইতেছে, এইখান হইতে শব ফেলিয়া দাও।" এই বলিয়া পিশাচেরা শৈবলিনীর মস্তকে পদাঘাত করিয়া শব ফেলিয়া দিল। শৈবলিনী ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পড়িতে লাগিল। ক্রমে ঘূর্ণগতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অবশেষে কুম্ভকারের চক্রের ন্যায় ঘুরিতে লাগিল। শবের মুখে, নাসিকায়, রক্তবমন হইতে লাগিল। ক্রমে নরকের গর্জ্জন নিকটে শুনা যাইতে লাগিল, পূতিগন্ধ বাড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইল। তাহার পরেই তাহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল, তখন সে মনে মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিল, মনে মনে ডাকিতে লাগিল,—"কোথায় তুমি, স্বামী! কোথায় প্রভু! স্ত্রীজাতির জীবন-সহায়, আরাধনার দেবতা, সর্ব্বেসর্ব্বমঙ্গল! কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর! তোমার চরণারবিন্দে সহস্র, সহস্র, সহস্র সহস্র প্রণাম! আমায় রক্ষা কর। তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া, আমি এই নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি—তুমি রক্ষা না করিলে কোন দেবতায় আমায় রক্ষা করিতে পারে না—আমায় রক্ষা কর। তুমি আমায় রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, এইখানে আসিয়া চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও, তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।"

তখন, অন্ধ, বধির, মৃতা শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল যে, কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল; সেই দুরন্ত নরক-রব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল—চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত। শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল।

চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, গুহামধ্যে অল্প আলোক প্রবেশ করিয়াছে; বাহিরে

পক্ষীর প্রভাতকূজন শুনা যাইতেছে—কিন্তু এ কি এ? কাহার অঙ্কে তাহার মাথা রহিয়াছে—কাহার মুখমণ্ডল তাহার মস্তোকপরে, গগনোদিত পূর্ণচন্দ্রবৎ এ প্রভাতান্ধকারকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে? শৈবলিনী চিনিল, চন্দ্রশেখর—ব্রহ্মচারীবেশে চন্দ্রশেখর!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকা ডুবিল

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শৈবলিনী!"

শৈবলিনী উঠিয়া বসিল, চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল; মাথা ঘুরিল; শৈবলিনী পড়িয়া গেল; মুখ চন্দ্রশেখরের চরণে ঘর্ষিত হইল। চন্দ্রশেখর তাহাকে ধরিয় তুলিলেন। তুলিয়া আপন শরীরের উপর ভর করিয়া শৈবলিনীকে বসাইলেন।

শৈবলিনী কাঁদিতে লাগিল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, চন্দ্রশেখরের চরণে পুনঃ পতিত হইয়া বলিল, "এখন আমার দশা কি হইবে!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে কেন?"

শৈবলিনী চক্ষু মুছিল, রোদন সম্বরণ করিল—স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "বো হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচিব।" শৈবলিনী শিহরিল—স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার মনে পড়িল—ক্ষণেক কপালে হাত দিয়া, নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, "অ দিন বাঁচিব—মরিবার আগে তোমাকে একবার দেখিতে সাধ হইয়াছিল। এ কথায় কি বিশ্বাস করিবে? কেন বিশ্বাস করিবে? যে ভ্রষ্টা হইয়া স্বামী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার আবার স্বামী দেখিতে সাধ কি?"

শৈবলিনী কাতরতার বিকট হাসি হাসিল।

চন্দ্র। তোমার কথাও অবিশ্বাস নাই—আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়াছিল।

শৈ। সে মিথ্যা কথা। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিলাম ডাকাইতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিল।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইলেন। ধীরে ধীরে শৈবলিনীকে পুনরপি শুয়াইলেন ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, গমনোন্মুখ হইয়া, মৃদুমধুর স্বরে বলিলেন "শৈবলিনী! দ্বাদশ বৎসর প্রায়শ্চিত্ত কর। উভয়ে বাঁচিয়া থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হইবে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।"

শৈবলিনী হাতযোড় করিল;—বলিল, "আর একবার বসো! বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নাই।" আবার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল—"বসো—তোমায় ক্ষণেক দেখি।"

চন্দ্রশেখর বসিলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?" শিবলিনী স্থির-দৃষ্টে চন্দ্রশেখরের প্রতি চহিয়াছিল, তাহার প্রফুল্ল নয়নপদ্ম জলে ভাসিতেছিল।

চন্দ্র। আছে। কেন মরিতে চাও?

শৈবলিনী শিহরিল। বলিল, "মরিতে পারিব না—সেই নরকে পড়িব।"

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই নরক হইতে উদ্ধার হইবে।

শৈব। এ মনোনরক হইতে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈব। এ পর্ব্বতে দেবতারা আসিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাকে কি করিয়াছেন, বলিতে পারি না—আমি রাত্রিদিন নরক-স্বপ্ন দেখি।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনীর দৃষ্টি গুহাপ্রান্তে স্থাপিত হইয়াছে—যেন দূরে কিছু দেখিতেছে। দেখিলেন, তাহার শীর্ণ বদনমণ্ডল বিশুষ্ক হইল—চক্ষুঃ বিস্ফারিত, পলকরহিত হইল—নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত, বিস্ফারিত হইতে লাগিল—শরীর কণ্টকিত হইল—কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিতেছ?"

শৈবলিনী কথা কহিল না, পূর্ব্ববৎ চাহিয়া রহিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ভয় পাইতেছ?"

শৈবলিনী প্রস্তরবৎ! চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইলেন—অনেকক্ষণ নীরব হইয়া শৈবলিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ শৈবলিনী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "প্রভু! রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী! তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

শৈবলিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল।

চন্দ্রশেখর নিকটস্থ নির্ঝর হইতে জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখে সিঞ্চন করিলেন। উত্তরীয়ের দ্বারা ব্যজন করিলেন। কিছুকাল পরে শৈবলিনী চেতনাপ্রাপ্ত হইল। শৈবলিনী উঠিয়া বসিল। নীরবে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "কি দেখিতেছিলে?"

শৈ। সেই নরক।

চন্দ্রশেখর দেখিলেন, জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে।

শৈবলিনী ক্ষণপরে বলিল, "আমি মরিতে পারিব না—আমার ঘোরতর নরকের ভয় হইয়াছে। মরিলেই নরকে যাইব। আমাকে বাঁচিতেই হইবে। কিন্তু একাকিনী, আমি দ্বাদশ বৎসর কি প্রকারে বাঁচিব? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরক দেখিতেছি।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চিন্তা নাই—উপবাসে এবং মানসিক ক্লেশে, এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। বৈদ্যরা ইহাকে বায়ুরোগ বলেন। তুমি বেদগ্রামে গিয়া গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর। সেখানে সুন্দরী আসিয়া তোমার তত্ত্বাবধারণ করিবেন—চিকিৎসা করিতে পারিবেন।"

সহসা শৈবলিনী চক্ষু মুদিল—দেখিল, গুহাপ্রান্তে সুন্দরী দাঁড়াইয়া, প্রস্তরে উৎকীর্ণা—অঙ্গুলি তুলিযা দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল, সুন্দরী অতি দীর্ঘাকৃতা, ক্রমে তালবৃক্ষপরিমিতা হইল, অতি ভয়ঙ্করী! দেখিল, সেই গুহাপ্রান্তে সহসা নরক সৃষ্ট হইল—সেই পূতিগন্ধ, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিগর্জ্জন, সেই উত্তাপ, সেই শীত, সেই সর্পারণ্য, সেই কদর্য্য কীটরাশিতে গগন অন্ধকার! দেখিল, সেই নরকে পিশাচেরা কণ্টকের রজ্জুহস্তে, বৃশ্চিকের বেত্রহস্তে নামিল—রজ্জুতে শৈবলিনীকে বাঁধিয়া, বৃশ্চিকবেত্রে প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল; তালবৃক্ষপরিমিতা প্রস্তরময়ী সুন্দরী হস্তোত্তলন করিয়া তাহাদিগকে বলিতে লাগিল—"মার্! মার্! আমি বারণ করিয়াছিলাম! আমি নৌকা হইতে ফিরাইতে গিয়াছিলাম, শুনে নাই! মার্! মার্! যত পারিস্ মার্! আমি উহার পাপের সাক্ষী! মার্! মার্!" শৈবলিনী যুক্তকরে, উন্নত আননে, সজল-নয়নে সুন্দরীকে মিনতি করিতেছে, সুন্দরী শুনিতেছে না; কেবল ডাকিতেছে, "মার্! মার্! অসতীকে মার্! আমি সতী, ও অসতী! মার্! মার্!" শৈবলিনী, আবার সেইরূপ দৃষ্টিস্থির লোচন বিস্ফারিত করিয়া বিশুষ্ক মুখে, স্তম্ভিতের ন্যায় রহিল। চন্দ্রশেখর চিন্তিত হইলেন—বুঝিলেন, লক্ষণ ভাল নহে। বলিলেন, "শৈবলিনি! আমার সঙ্গে আইস!"

প্রথমে শৈবলিনী শুনিতে পাইল না। পরে চন্দ্রশেখর, তাহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া দুই তিন বার সঞ্চালিত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, বলিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

সহসা শৈবলিনী দাঁড়াইয়া উঠিল, অতি ভীতস্বরে বলিল, "চল, চল, চল, শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, এখান হইতে শীঘ্র চল!" বলিয়াই, বিলম্ব না করিয়া, গুহাদ্বারাভিমুখে ছুটিল, চন্দ্রশেখরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিল। দ্রুত চলিতে, গুহার অস্পষ্ট

আলোকে পদে শিলাখণ্ড বাজিল ; পদস্খলিত হইয়া শৈবলিনী ভূপতিতা হইল। আর শব্দ নাই। চন্দ্রশেখর দেখিলেন, শৈবলিনী আবার মূর্চ্ছিতা হইয়াছে।

তখন চন্দ্রশেখর, তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া, যথায় পর্ব্বতাঙ্গ হইতে অতি ক্ষীণা নির্ঝরিণী নিঃশব্দে জলোদ্গার করিতেছিল—তথায় আনিলেন। মুখে জলসেক করাতে, এবং অনাবৃত স্থানের অনবরুদ্ধ বায়ুস্পর্শে শৈবলিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু চাহিল—বলিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি তোমাকে বাহিরে আনিয়াছি।"

শৈবলিনী শিহরিল—আবার ভীতা হইল। বলিল, "তুমি কে ?" চন্দ্রশেখরও ভীত হইলেন। বলিলেন, "কেন এরূপ করিতেছ ? আমি যে তোমার স্বামী—চিনিতে পারিতেছ না কেন ?"

শৈবলিনী হা হা করিয়া হাসিল, বলিল,—

"স্বামী আমার সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে ;
তেকাটাতে এলে, সখা, বুঝি পথ ভুলে ?

তুমি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর দেখিলেন যে, যে দেবীর প্রভাবেই এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন—বিকট উন্মাদ আসিয়া তাঁহার সুবর্ণমন্দির অধিকার করিতেছে। চন্দ্রশেখর রোদন করিলেন। অতি মৃদুস্বরে, কত আদরে আবার ডাকিলেন, "শৈবলিনী !"

শৈবলিনী আবার হাসিল, বলিল, "শৈবলিনী কে ? রসো রসো ! একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক দিন রাত্রে ছেলেটি সাপ হয়ে বনে গেল ; মেয়েটি ব্যাঙ্ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙ্‌টিকে গিলিয়া ফেলিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছি। হ্যাঁ গা সাহেব ! তুমি কি লরেন্স ফষ্টর ?"

চন্দ্রশেখর গদগদকণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "গুরুদেব ! এ কি করিলে ? এ কি করিলে ?"

শৈবলিনী গীত গাইল,—

"কি করিলে প্রাণসখী, মনচোরে ধরিয়ে,
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে,"

বলিতে লাগিল, "মনচোর কে ? চন্দ্রশেখর। ধরিল কাকে ? চন্দ্রশেখরকে। ভাসিল কে ? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি ? জানি না। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন ?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি চন্দ্রশেখর।"

শৈবলিনী ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপ দিয়া চন্দ্রশেখরের কণ্ঠলগ্ন হইল—কোন কথা না

বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল—কত কাঁদিল—তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠ, কণ্ঠ, বক্ষ, বস্ত্র, বাহু প্লাবিত হইল। চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন। শৈবলিনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "চল!"

শৈবলিনী বলিল, "আমাকে মারিবে না!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর গাত্রোত্থান করিলেন। শৈবলিনীও উঠিল। চন্দ্রশেখর বিষণ্ণবদনে চলিলেন—উন্মাদিনী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—কখন হাসিতে লাগিল—কখন কাঁদিতে লাগিল—কখন গায়িতে লাগিল।

পঞ্চম খণ্ড

প্রচ্ছাদন

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমিয়টের পরিণাম

মুরশিদাবাদে আসিয়া, ইংরেজের নৌকাসকল পৌঁছিল। মীর কাসেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর নিকট সম্বাদ আসিল যে, আমিয়ট পৌঁছিয়াছে।

মহাসমারোহের সহিত আসিয়া মহম্মদ তকি আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমিয়ট আপ্যায়িত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ পরিশেষে আমিয়টকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন, কিন্তু প্রফুল্লমনে নহে। এদিকে মহম্মদ তকি, দূরে অলক্ষিতরূপে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন—ইংরেজের নৌকা খুলিয়া না যায়।

মহম্মদ তকি চলিয়া গেলে, ইংরেজরা পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণে যাওয়া কর্ত্তব্য কি না। গলষ্টন্ ও জন্‌সন্ এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, ভয় কাহাকে বলে, তাহা ইংরেজ জানে না, জানাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে। আমিয়ট বলিলেন, "যখন ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি, এবং অসদ্ভাব যত দূর হইতে হয় হইয়াছে, তখন আবার ইহাদিগের সঙ্গে আহার ব্যবহার কি?" আমিয়ট স্থির করিলেন, নিমন্ত্রণে যাইবেন না।

এদিকে যে নৌকায় দলনী ও কুল্‌সম বন্দিস্বরূপে সংরক্ষিতা ছিলেন, সে

নৌকাতেও নিমন্ত্রণের সম্বাদ পৌঁছিল। দলনী ও কুল্‌সম্ কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিল। দলনী বলিল, "কুল্‌সম্ শুনিতেছ? বুঝি মুক্তি নিকট।"

কু। কেন?

দ। তুই যেন কিছুই বুঝিস্ না; যাহারা নবাবের বেগমকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে—তাহাদের যে নবাবের পক্ষ হইতে সাদর নিমন্ত্রণ হইয়াছে, ইহার ভিতর কিছু গূঢ় অর্থ আছে। বুঝি আজি ইংরেজ মরিবে।

কু। তাতে কি তোমার আহ্লাদ হইয়াছে?

দ। নহে কেন? একটা রক্তারক্তি না হইলেই ভাল হয়। কিন্তু যাহারা আমাকে অনর্থক কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহারা মরিলে যদি আমরা মুক্তি পাই, তাহাতে আমার আহ্লাদ বৈ নাই।

কু। কিন্তু মুক্তির জন্য এত ব্যস্ত কেন? আমাদের আটক রাখা ভিন্ন ইহাদের আর কোন অভিসন্ধি দেখা যায় না। আমাদের উপর আর কোন দৌরাত্ম্য করিতেছে না। কেবল আটক। আমরা স্ত্রীজাতি, যেখানে যাইব, সেইখানেই আটক।

দলনী বড় রাগ করিল। বলিল, "আপন ঘরে আটক থাকিলেও আমি দলনী বেগম, ইংরেজের নৌকায় আমি বাঁদী। তোর সঙ্গে কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। আমাদের কেন আটক করিয়া রাখিয়াছে, বলিতে পারিস্?"

কু। তা ত বলিয়াই রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যেমন হে সাহেব ইংরেজের জামিন হইয়া আটক আছে, আমরাও তেমনি নবাবের জামিন হইয়া ইংরেজের কাছে আটক আছি। হে সাহেবকে ছাড়িয়া দিলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। হে সাহেবের কোন অনিষ্ট ঘটিলেই আমাদেরও অনিষ্ট ঘটিবে; নইলে ভয় কি?

দলনী আরও রাগিল, বলিল, "আমি তোর হে সাহেবকে চিনি না, তোর ইংরেজের গোঁড়ামি শুনিতে চাহি না। ছাড়িয়া দিলেও তুই বুঝি যাইবি না?"

কুল্‌সম্ রাগ না করিয়া হাসিয়া বলিল, "যদি আমি না যাই, তবে তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাও?"

দলনীর রাগ বাড়িতে লাগিল, বলিল, "তাও কি সাধ না কি?"

কুল্‌সম্ গম্ভীরভাবে বলিল, "কপালের লিখন কি বলিতে পারি?"

দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, বড় জোরে একটা ছোট কিল উঠাইল। কিন্তু কিলটি আপাততঃ পুঁজি করিয়া রাখিল—ছাড়িল না। দলনী আপন কর্ণের নিকট সেই কিলটি উত্থিত করিয়া—কৃষ্ণকেশগুচ্ছ সংস্পর্শে যে কর্ণ, সভ্রমর প্রস্ফুট কুসুমবৎ শোভা

পাইতেছিল, তাহার নিকট কমল কোরকতুল্য বদ্ধ মুষ্টি স্থির করিয়া বলিল, "তোকে আমিয়ট দুই দিন কেন ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বল্ ত ?"

কু। সত্য কথা ত বলিয়াছি, তোমার কোন কষ্ট হইতেছে কি না—তাহাই জানিবার জন্য সাহেবদিগের ইচ্ছা, যত দিন আমরা ইংরেজের নৌকায় থাকি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি। জগদীশ্বর করুন, ইংরেজ আমাদের না ছাড়ে।

দলনী কিল আরও উচ্চ করিয়া তুলিয়া বলিল, "জগদীশ্বর করুন, তুমি শীঘ্র মর।"

কু। ইংরেজ ছাড়িলে, আমরা ফের নবাবের হাতে পড়িব। নবাব তোমাকে ক্ষমা করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমায় ক্ষমা করিবেন না, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারি। আমার এমন মন হয় যে, যদি কোথায় আশ্রয় পাই, তবে আর নবাবের হুজুরে হাজির হইব না।

দলনী রাগ ত্যাগ করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, "আমি অনন্যগতি। মরিতে হয়, তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব।"

এদিকে আমিয়ট আপনার আজ্ঞাধীন সিপাহীগণকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। জন্‌সন্ বলিলেন, "এখানে আমরা তত বলবান্ নহি—রেসিডেন্সির নিকট নৌকা লইয়া গেলে হয় না ?"

আমিয়ট বলিলেন, "যে দিন, এক জন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেই দিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। এখান হইতে নৌকা খুলিলেই মুসলমান বুঝিবে যে, আমরা ভয়ে পলাইলাম। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না। কিন্তু ফষ্টর পীড়িত। শত্রুহস্তে মরিতে অক্ষম—অতএব তাহাকে রেসিডেন্সিতে যাইতে অনুমতি কর। তাহার নৌকায় বেগম ও দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে উঠাইয়া দাও। এবং দুই জন সিপাই সঙ্গে দাও। বিবাদের স্থানে উহাদের থাকা অনাবশ্যক।"

সিপাহীগণ সজ্জিত হইলে, আমিয়টের আজ্ঞানুসারে নৌকার মধ্যে সকলে প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিল। ঝাঁপের বেড়ার নৌকায় সহজেই ছিদ্র পাওয়া যায়, প্রত্যেক সিপাহী এক এক ছিদ্রের নিকটে বন্দুক লইয়া বসিল। আমিয়েটের আজ্ঞানুসারে দলনী ও কুল্‌সম্ ফষ্টরের নৌকায় উঠিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে ফষ্টরের নৌকা খুলিয়া গেল। দেখিয়া মহম্মদ তকির প্রহরীরা তাঁহাকে সম্বাদ দিতে গেল।

এ সম্বাদ শুনিয়া এবং ইংরেজদিগের আসিবার সময় অতীত হইল দেখিয়া, মহম্মদ তকি, ইংরেজদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। আমিয়ট উত্তর করিলেন যে, কারণবশতঃ তাঁহারা নৌকা হইতে উঠিতে অনিচ্ছুক।

দূত নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া কিছু দূরে আসিয়া, একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। সেই শব্দের সঙ্গে, তীর হইতে দশ বারোটা বন্দুকের শব্দ হইল। আমিয়ট দেখিলেন, নৌকার উপর গুলীবর্ষণ হইতেছে এবং স্থানে স্থানে নৌকার ভিতরে গুলী প্রবেশ করিতেছে।

তখন ইংরেজ সিপাহীরাও উত্তর দিল। উভয় পক্ষে, উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়াতে শব্দে বড় হুলস্থূল পড়িল। কিন্তু উভয় পক্ষই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। মুসলমানেরা তীরস্থ গৃহাদির অন্তরালে লুক্কায়িত; ইংরেজ এবং তাঁহাদিগের সিপাহীগণ নৌকামধ্যে লুক্কায়িত। এরূপ যুদ্ধে বারুদ খরচ ভিন্ন অন্য ফলের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন, মুসলমানেরা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, তরবারি ও বর্শা হস্তে চীৎকার করিয়া আমিয়টের নৌকাভিমুখে ধাবিত হইল। দেখিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইংরেজেরা ভীত হইল না।

স্থির চিত্তে নৌকামধ্য হইতে দ্রুতাবতরণপ্রবৃত্ত মুসলমানদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমিয়ট, গল্‌ষ্টন্‌ ও জন্‌সন্‌, স্বহস্তে বন্দুক লইয়া অব্যর্থ সন্ধানে প্রতি বারে, এক এক জনে এক এক জন যবনকে বালুকাশায়ী করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যেরূপ তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ যবনশ্রেণীর উপর যবন-শ্রেণী নামিতে লাগিল। তখন আমিয়ট বলিলেন, "আর আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই। আইস আমরা বিধর্ম্মী নিপাত করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি।"

ততক্ষণে মুসলমানেরা গিয়া আমিয়টের নৌকায় উঠিল। তিন জন ইংরেজ এক হইয়া এককালীন আওয়াজ করিলেন। ত্রিশূলবিভিন্নের ন্যায় নৌকারূঢ় যবনশ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নৌকা হইতে জলে পড়িল।

আরও মুসলমান নৌকার উপর উঠিল। আরও কতকগুলা মুসলমান মুদ্গরাদি লইয়া নৌকার তলে আঘাত করিতে লাগিল। নৌকার তলদেশ ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, কলকল শব্দে তরণী জলপূর্ণ হইতে লাগিল।

আমিয়ট সঙ্গীদিগকে বলিলেন, "গোমেষাদির ন্যায় জলে ডুবিয়া মরিব কেন? বাহিরে আইস, বীরের ন্যায় অস্ত্রহস্তে মরি।"

তখন তরবারি হস্তে তিন জন ইংরেজ অকুতোভয়ে, সেই অগণিত যবনগণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন যবন, আমিয়টকে সেলাম করিয়া বলিল, "কেন মরিবেন? আমাদিগের সঙ্গে আসুন।"

আমিয়ট বলিলেন, "মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে, ভারতবর্ষে যে

আগুন জলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জ্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।"

"তবে মর।" এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে গল্‌ষ্টন্ সেই পাঠানের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত করিলেন।

তখন দশ বার জন যবনে গল্‌ষ্টন্‌কে ঘেরিয়া প্রহার করিতে লাগিল। এবং অচিরাৎ, বহু লোকের প্রহারে আহত হইয়া গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ উভয়েই প্রাণত্যাগ করিয়া নৌকার উপর শুইলেন।

তৎপূর্ব্বেই ফষ্টর নৌকা খুলিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবার সেই

যখন রামচরণের গুলি খাইয়া লরেন্স ফষ্টর গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তখন প্রতাপ বজরা খুলিয়া গেলে পর, হাতিয়ারের নৌকার মাঝিরা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ফষ্টরের দেহের সন্ধান করিয়া উঠাইয়াছিল; সেই নৌকার পাশ দিয়াই ফষ্টরের দেহ ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহারা ফষ্টরকে উঠাইয়া নৌকায় রাখিয়া আমিয়টকে সম্বাদ দিয়াছিল।

আমিয়ট সেই নৌকার উপরে আসিলেন। দেখিলেন, ফষ্টর অচেতন, কিন্তু প্রাণ নির্গত হয় নাই। মস্তিষ্ক ক্ষত হইয়াছিল বলিয়া চেতনা বিনষ্ট হইয়াছিল। ফষ্টরের মরিবারই অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। আমিয়ট চিকিৎসা জানিতেন, রীতিমত তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। বকাউল্লার প্রদত্ত সন্ধান মতে, ফষ্টরের নৌকা খুঁজিয়া ঘাটে আনিলেন। যখন আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রা করেন, তখন মৃতবৎ ফষ্টরকে সেই নৌকায় তুলিয়া আনিলেন।

ফষ্টরের পরমায়ু ছিল—সে চিকিৎসায় বাঁচিল। আবার পরমায়ু ছিল, মুরশিদাবাদে মুসলমান-হস্তে বাঁচিল। কিন্তু এখন সে রুগ্ন, বলহীন—তেজোহীন,—আর সে সাহস—সে দম্ভ নাই। এক্ষণে সে প্রাণভয়ে ভীত, প্রাণভয়ে পলাইতেছিল। মস্তিষ্কের আঘাত জন্য, বুদ্ধিও কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়াছিল।

ফষ্টর দ্রুত নৌকা চালাইতেছিল—তথাপি ভয়, পাছে মুসলমান পশ্চাদ্ধাবিত হয়। প্রথমে সে কাশিমবাজারের রেসিডেন্সিতে আশ্রয় লইবে মনে করিয়াছিল—

তাহাতে ভয় হইল, পাছে মুসলমান গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। সুতরাং সে অভিপ্রায় ত্যাগ করিল। এ স্থলে ফষ্টর যথার্থ অনুমান করিয়াছিল। মুসলমানেরা অচিরাৎ কাশিমবাজারে গিয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করিয়া তাহা লুঠ করিল।

ফষ্টর দ্রুতবেগে কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ, রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়া গেল। তথাপি ভয় যায় না। যে কোন নৌকা পশ্চাতে আইসে, মনে করে, যবনের নৌকা আসিতেছে। দেখিল, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা কোন মতেই সঙ্গ ছাড়িল না।

ফষ্টর তখন রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভ্রান্ত বুদ্ধিতে নানা কথা মনে আসিতে লাগিল। একবার মনে করিল যে, নৌকা ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া পলাই। আবার ভাবিল, পলাইতে পারিব না—আমার সে বল নাই। আবার ভাবিল, জলে ডুবি,—আবার ভাবিল, জলে ডুবিলে বাঁচিলাম কই? আবার ভাবিল যে, এই দুইটা স্ত্রীলোককে জলে ফেলিয়া নৌকা হাল্কা করি—নৌকা আরও শীঘ্র যাইবে।

অকস্মাৎ তাহার এক কুবুদ্ধি উপস্থিত হইল। এই স্ত্রীলোকদিগের জন্য যবনেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে, ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। দলনী যে নবাবের বেগম, তাহা সে শুনিয়াছিল—মনে ভাবিল, বেগমের জন্যই মুসলমানেরা ইংরেজের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। অতএব বেগমকে ছাড়িয়া দিলে আর কোন গোল থাকিবে না। সে স্থির করিল যে, দলনীকে নামাইয়া দিবে।

দলনীকে বলিল, "ঐ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আমাদের পাছু পাছু আসিতেছে দেখিতেছ?"

দলনী বলিল, "দেখিতেছি।"

ফ। উহা তোমাদের লোকের নৌকা—তোমাকে কাড়িয়া লইবার জন্য আসিতেছে।

এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল? কিছুই না, কেবল ফষ্টরের বিকৃত বুদ্ধিই ইহার কারণ,—সে রজ্জুতে সর্প দেখিল। দলনী যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে এ কথায় সন্দেহ করিত। কিন্তু যে যাহার জন্য ব্যাকুল হয়, সে তাহার নামেই মুগ্ধ হয়, আশায় অন্ধ হইয়া বিচারে পরাঙ্মুখ হয়। দলনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সে কথায় বিশ্বাস করিল—বলিল, "তবে কেন ঐ নৌকায় আমাদের উঠাইয়া দাও না। তোমাকে অনেক টাকা দিব।"

ফ। আমি তাহা পারিব না। উহারা আমার নৌকা ধরিতে পারিলে আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

দ। আমি বারণ করিব।

ফ। তোমার কথা শুনিবে না। তোমাদের দেশের লোক স্ত্রীলোকের কথা গ্রাহ্য করে না।

দলনী তখন ব্যাকুলতাবশতঃ জ্ঞান হারাইল—ভাল মন্দ ভাবিয়া দেখিল না। যদি ইহা নিজামতের নৌকা না হয়, তবে কি হইবে, তাহা ভাবিল না; এ নৌকা যে নিজামতের নহে, সে কথা তাহার মনে আসিল না। ব্যাকুলতাবশতঃ আপনাকে বিপদে নিক্ষেপ করিল, বলিল, "তবে আমাদের তীরে নামাইয়া দিয়া তুমি চলিয়া যাও।"

ফষ্টর সানন্দে সম্মত হইল। নৌকা তীরে লাগাইতে হুকুম দিল।

কুল্‌সম্ বলিল, "আমি নামিব না। আমি নবাবের হাতে পড়িলে, আমার কপালে কি আছে, বলিতে পারি না। আমি সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায় যাইব—সেখানে আমার জানা-শুনা লোক আছে।"

দলনী বলিল, "তোর কোন চিন্তা নাই। যদি আমি বাঁচি, তবে তোকেও বাঁচাইব।"

কুল্‌সম্। তুমি বাঁচিলে ত?

কুল্‌সম্ কিছুতেই নামিতে রাজি হইল না। দলনী তাহাকে অনেক বিনয় করিল—সে কিছুতেই শুনিল না।

ফষ্টর কুল্‌সম্‌কে বলিল, "কি জানি, যদি তোমার জন্য নৌকা পিছু পিছু আইসে। তুমিও নাম।"

কুল্‌সম্ বলিল, "যদি আমাকে ছাড়, তবে আমি ঐ নৌকায় উঠিয়া, যাহাতে নৌকাওয়ালারা তোমার সঙ্গ না ছাড়ে, তাহাই করিব।"

ফষ্টর ভয় পাইয়া আর কিছু বলিল না—দলনী কুল্‌সমের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়া নৌকা হইতে উঠিল। ফষ্টর নৌকা খুলিয়া চলিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্তের অল্পমাত্র বিলম্ব আছে।

ফষ্টরের নৌকা ক্রমে দৃষ্টির বাহির হইল। যে ক্ষুদ্র তরণীকে নিজামতের নৌকা ভাবিয়া ফষ্টর দলনীকে নামাইয়া দিয়াছিল, সে নৌকাও নিকটে আসিল। প্রতিক্ষণে দলনী মনে করিতে লাগিল যে, নৌকা এইবার তাঁহাকে তুলিয়া লইবার জন্য ভিড়িবে; কিন্তু নৌকা ভিড়িল না। তখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে কি না, এই সন্দেহে দলনী অঞ্চল উর্দ্ধোত্থিত করিয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। তথাপি নৌকা ফিরিল না। বাহিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় দলনীর

চমক হইল—এ নৌকা নিজামতের কিসে সিদ্ধান্ত করিলাম! অপরের নৌকা হইতেও পারে! দলনী তখন ক্ষিপ্তার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে সেই নৌকার নাবিকদিগকে ডাকিতে লাগিল। "এ নৌকায় হইবে না" বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। ফষ্টরের নৌকা তখন দৃষ্টির অতীত হইয়াছিল—তথাপি সে কূলে কূলে দৌড়িল, তাহা ধরিতে পারিবে বলিয়া দলনী কূলে কূলে দৌড়িল। কিন্তু বহুদূরে দৌড়িয়া নৌকা ধরিতে পারিল না। পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল। গঙ্গার উপরে আর কিছু দেখা যায় না—অন্ধকারে কেবল বর্ষার নববারি প্রবাহের কলকল ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। তখন হতাশ হইয়া দলনী, উন্মূলিত ক্ষুদ্র বৃক্ষের ন্যায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে দলনী, আর গঙ্গাগর্ভমধ্যে বসিয়া কোন ফল নাই বিবেচনা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। অন্ধকারে উঠিবার পথ দেখা যায় না। দুই একবার পড়িয়া উঠিল। উঠিয়া ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে, চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, কোন দিকে কোন গ্রামের কোন চিহ্ন নাই—কেবল অনন্ত প্রান্তর, আর সেই কলনাদিনী নদী, মনুষ্যের ত কথাই নাই—কোন দিকে আলো দেখা যায় না—গ্রাম দেখা যায় না—বৃক্ষ দেখা যায় না—পথ দেখা যায় না—শৃগাল কুক্কুর ভিন্ন কোন জন্তু দেখা যায় না—কলনাদিনী নদী-প্রবাহে নক্ষত্র নাচিতেছে দেখা যায়। দলনী মৃত্যু নিশ্চয় করিল।

সেইখানে প্রান্তরমধ্যে নদীর অনতিদূরে দলনী বসিল। নিকটে ঝিল্লী রব করিতে লাগিল—নিকটেই শৃগাল ডাকিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গভীরা হইল—অন্ধকার ক্রমে ভীমতর হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে, দলনী মহাভয় পাইয়া দেখিল, সেই প্রান্তর মধ্যে, এক দীর্ঘাকার পুরুষ একা বিচরণ করিতেছে। দীর্ঘাকৃত পুরুষ বিনা বাক্যে পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

আবার সেই! এই দীর্ঘাকৃত পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্ব্বতারোহণ করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নৃত্যগীত

মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মাহতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায়

শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপমধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালা-রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণমুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি-খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,—আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বলে মধুরে মিশাইতেছিল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিতেছিল! যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ভাহু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে, সূর্য্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্র-কিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু-প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিং শ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিকপাত্রে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণ বায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজতমুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে মিশিল গুর্‌গন খাঁ।

বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই পাটনার এলিস্ সাহেব পাটনার দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু মুঙ্গের হইতে মুসলমান সৈন্য প্রেরিত হইয়া, পটনাস্থিত মুসলমান সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া, পাটনা পুনর্ব্বার মীর

কাসেমের অধিকারে লইয়া আইসে। এলিস্ প্রভৃতি পাটনাস্থিত ইংরাজেরা মুসলমান-দিগের হস্তে পতিত হইয়া, মুঙ্গেরে বন্দিভাবে আনীত হয়েন। এক্ষণে উভয় পক্ষে প্রকৃতভাবে রণসজ্জা করিতেছিলেন। শেঠদিগের সহিত গুর্‌গন্ খাঁ সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। নৃত্য গীত উপলক্ষ মাত্র। জগৎশেঠেরা বা গুর্‌গন্ খাঁ কেহই তাহা শুনিতেছিলেন না। সকলে যা করে, তাঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। শুনিবার জন্য কে কবে সঙ্গীতের অবতারণা করায়?

গুর্‌গন্ খাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল—তিনি মনে করিলেন যে, উভয় পক্ষ বিবাদ করিয়া ক্ষীণবল হইলে তিনি উভয় পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবেন। কিন্তু সে অভিলাষসিদ্ধির পক্ষে প্রথম আবশ্যক যে, সেনাগণ তাঁহারই বাধ্য থাকে। সেনাগণ অর্থ ভিন্ন বশীভূত হইবে না—শেঠকুবেরগণ সহায় না হইলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। অতএব শেঠদিগের সঙ্গে পরামর্শ গুর্‌গন্ খাঁর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এ দিকে, কাসেম আলি খাঁও বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে পক্ষকে এই কুবেরযুগল অনুগ্রহ করিবেন, সেই পক্ষ জয়ী হইবে। জগৎশেঠেরা যে মনে মনে তাঁহার অহিতাকাঙ্ক্ষী, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন; কেন না, তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। সন্দেহবশতঃ তাঁহাদিগকে মুঙ্গেরে বন্দিস্বরূপ রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই তাঁহার বিপক্ষের সঙ্গে মিলিত হইবে, ইহা স্থির করিয়া তিনি শেঠদিগকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেঠেরা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত তাহারা ভয়প্রযুক্ত মীর কাসেমের প্রতিকূলে কোন আচরণ করেন নাই; কিন্তু এক্ষণে অন্যথা রক্ষার উপায় না দেখিয়া, গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে মিলিল। মীর কাশেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিনা কারণে জগৎশেঠদিগের সঙ্গে গুর্‌গন্ খাঁ দেখা-সাক্ষাৎ করিলে নবাব সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন বিবেচনায়, জগৎশেঠেরা এই উৎসবের সৃজন করিয়া, গুর্‌গন্ এবং অন্যান্য রাজামাত্যবর্গকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন।

গুর্‌গন্ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছিলেন। এবং অন্যান্য অমাত্যগণ হইতে পৃথক্ বসিয়াছিলেন। জগৎশেঠেরা যেমন সকলের নিকট আসিয়া এক একবার আলাপ করিতেছিলেন—গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে সেইরূপ মাত্র—অধিকক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিলেন না। কিন্তু কথাবার্ত্তা অন্যের অশ্রাব্য স্বরে হইতেছিল। কথোপকথন এইরূপ—

গুর্‌গন্ খাঁ বলিতেছেন, "আপনাদের সঙ্গে আমি একটি কুঠি খুলিব, আপনারা বখরাদার হইতে স্বীকার আছেন?"

মাহতাব্‌চন্দ্‌। কি মতলব ?

গুর্‌। মুঙ্গেরের বড় কুঠি বন্ধ করিবার জন্য।

মাহ। স্বীকৃত আছি—এরূপ একটা নূতন কারবার না আরম্ভ করিলে আমাদের আর কোন উপায় দেখি না।

গুর্‌গন্‌ খাঁ বলিলেন, "যদি আপনারা স্বীকৃত হয়েন, তবে টাকার আঞ্জামটা আপনাদিগের করিতে হইবে—আমি শারীরিক পরিশ্রম করিব।"

সেই সময় মনিয়া বাই নিকটে আসিয়া সনদী খেয়াল গাইল,—"শিখে হো ছল ভালা" ইত্যাদি। শুনিয়া মাহতাব্‌ হাসিয়া বলিলেন, "কাকে বলে ? যাক—আমরা রাজি আছি—আমাদের মূলধন সুদে আসলে বজায় থাকিলেই হইল—কোন দায়ে না ঠেকি।"

এইরূপে এক দিকে, বাইজি কেদার, হাম্বির, ছায়ানট ইত্যাদি রাগ ঝাড়িতে লাগিল, আর এক দিকে গুর্‌গন্‌ খাঁ ও জগৎশেঠ রূপেয়া, নোক্‌সান, দর্শনী প্রভৃতি ছেঁদো কথায় আপনাদিগের পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা স্থির হইলে গুর্‌গন্‌ বলিতে লাগিলেন, "একজন নূতন বণিক্‌ কুঠি খুলিতেছে, কিছু শুনিয়াছেন ?"

মাহ। না—দেশী না বিলাতী ?

গুর্‌। দেশী।

মাহ। কোথায় ?

গুর্‌। মুঙ্গের হইতে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সকল স্থানে। যেখানে পাহাড়, যেখানে জঙ্গল, যেখানে মাঠ, সেইখানে তাহার কুঠি বসিতেছে।

মাহ। ধনী কেমন ?

গুর্‌। এখনও বড় ভারী ধনী নয়—কিন্তু কি হয় বলা যায় না।

মাহ। কার সঙ্গে তাহার লেনদেন ?

গুর্‌। মুঙ্গেরের বড় কুঠির সঙ্গে।

মাহ। হিন্দু না মুসলমান ?

গুর্‌। হিন্দু।

মাহ। নাম কি ?

গুর্‌। প্রতাপ রায়।

মাহ। বাড়ী কোথায় ?

গুর্‌। মুরশিদাবাদের নিকটে।

মাহ। নাম শুনিয়াছি—সে সামান্য লোক।

গুর্। অতি ভয়ানক লোক।

মাহ। কেন সে হঠাৎ এ প্রকার করিতেছে?

গুর্। কলিকাতার বড় কুঠির উপর রাগ।

মাহ। তাহাকে হস্তগত করিতে হইবে—সে কিসের বশ?

গুর্। কেন সে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত, তাহা না জানিলে বলা যায় না। যদি অর্থলোভে বেতনভোগী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে কিনিতে কতক্ষণ? জমীজমা তালুক মুলুকও দিতে পারি। কিন্তু যদি ভিতরে আর কিছু থাকে?

মাহ। আর কি থাকিতে পারে? কিসে প্রতাপ রায় এত মাতিল?

বাইজি সে সময় গায়িতেছিল, "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে।"

মাহতাব্‌চন্দ্‌ বলিলেন, "তাই কি? কার গোরা মুখ?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দলনী কি করিল?

মহাকায় পুরুষ নিঃশব্দে দলনীর পাশে আসিয়া বসিল। দলনী কাঁদিতেছিল, ভয় পাইয়া রোদন সম্বরণ করিল, নিস্পন্দ হইয়া রহিল। আগন্তুকও নিঃশব্দে রহিল।

যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছিল, ততক্ষণ অন্যত্র দলনীর আর এক সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইতেছিল।

মহম্মদ তকির প্রতি গুপ্ত আদেশ ছিল যে, ইংরেজদিগের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে হস্তগত করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবে। মহম্মদ তকি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বন্দী বা হত হইলে বেগম কাজে কাজেই তাঁহার হস্তগতা হইবেন। সুতরাং অনুচরবর্গকে বেগম সম্বন্ধে কোন বিশেষ উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। পরে যখন মহম্মদ তকি দেখিলেন, নিহত ইংরেজদিগের নৌকায় বেগম নাই, তখন তিনি বুঝিলেন যে, বিষম বিপদ উপস্থিত। তাঁহার শৈথিল্যে বা অমনোযোগে নবাব রুষ্ট হইয়া কি উৎপাত উপস্থিত করিবেন, তাহা

বলা যায় না। এই আশঙ্কায় ভীত হইয়া, মহম্মদ তকি সাহসে ভর করিয়া নবাবকে বঞ্চনা করিবার কল্পনা করিলেন। লোকপরম্পরায় তখন শুনা যাইতেছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ইংরেজেরা মীরজাফরকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার মস্‌নদে বসাইবেন। যদি ইংরেজেরা যুদ্ধজয়ী হয়েন, তবে মীর কাসেম এ প্রবঞ্চনা শেষে জানিতে পারিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আপাততঃ বাঁচিতে পারিলেই অনেক লাভ। পরে যদিই মীর কাসেম জয়ী হয়েন, তবে তিনি যাহাতে প্রকৃত ঘটনা কখন না জানিতে পারেন, এমত উপায় করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন কঠিন আজ্ঞা না আসে। এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া তকি সেই রাত্রে নবাবের সমীপে মিথ্যাকথা-পরিপূর্ণ এক আরজি পাঠাইতেছিলেন।

মহম্মদ তকি নবাবকে লিখিলেন যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছে। তকি তাঁহাকে আনিয়া যথাসম্মানপূর্ব্বক কেল্লার মধ্যে রাখিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে হজুরে পাঠাইতে পারিতেছেন না। ইংরেজদিগের সঙ্গী খান্‌সামা, নাবিক, সিপাহী প্রভৃতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদের সকলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন যে, বেগম আমিয়টের উপপত্নীস্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন। উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিতেন। বেগম স্বয়ং এ সকল কথা স্বীকার করিতেছেন। তিনি এক্ষণে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তিনি মুঙ্গেরে যাইতে অসম্মত। বলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি কলিকাতায় গিয়া আমিয়ট সাহেবের সুহৃদ্‌গণের নিকট বাস করিব। যদি না ছাড়িয়া দাও, তবে আমি পলাইয়া যাইব। যদি মুঙ্গেরে পাঠাও, তবে আমি আত্মহত্যা করিব।" এমত অবস্থায় তাঁহাকে মুঙ্গেরে পাঠাইবেন, কি এখানে রাখিবেন, কি ছাড়িয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে আজ্ঞার প্রত্যাশায় রহিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। তকি এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন।

অশ্বারোহী দূত সেই রাত্রেই এই পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল।

কেহ কেহ বলে, দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত অমঙ্গল ঘটনাও আমাদিগের মন জানিতে পারে। এ কথা যে সত্য, এমত নহে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মুরশিদাবাদ হইতে অশ্বারোহী দূত দলনীবিষয়ক পত্র লইয়া মুঙ্গেরে যাত্রা করিল, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার পার্শ্বস্থ বলিষ্ট পুরুষ, প্রথম কথা কহিল তাহার কণ্ঠস্বরে হউক, অমঙ্গল সূচনায় হউক, যাহাতে হউক, সেই মুহূর্ত্তে দলনীর শরীর কণ্টকিত হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষ বলিল, "তোমায় চিনি। তুমি দলনী বেগম।"

দলনী শিহরিল।

পার্শ্বস্থ পুরুষ পুনরপি কহিল, "জানি, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ।"

দলনীর চক্ষের প্রবাহ আবার ছুটিল। আগন্তুক কহিল, "এক্ষণে তুমি কোথায় যাইবে?"

সহসা দলনীর ভয় দূর হইয়াছিল। ভয় বিনাশের দলনী বিশেষ কারণ পাইয়াছিল। দলনী বলিল, "যাইব কোথায়? আমার যাইবার স্থান নাই। এক যাইবার স্থান আছে—কিন্তু সে অনেক দূর। কে আমাকে সেখানে লইয়া যাইবে?"

আগন্তুক বলিলেন, "তুমি নবাবের নিকটে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।"

দলনী উৎকণ্ঠিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "কেন?"

"অমঙ্গল ঘটিবে।"

দলনী শিহরিল, বলিল, "ঘটুক। সেই বৈ আর আমার স্থান নাই। অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।"

"তবে উঠ। আমি তোমাকে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি। মহম্মদ তকি তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু আমার কথা শুন। এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। নবাব স্বীয় পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তুমি সেখানে যাইও না।"

"আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাইব।"

"তোমার কপালে মুঙ্গের দর্শন নাই।"

দলনী চিন্তিত হইল। বলিল, "ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আপনার সঙ্গে আমি মুরশিদাবাদ যাইব। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখিবার আশা ছাড়িব না।"

আগন্তুক বলিলেন, "তাহা জানি। আইস।"

দুইজনে অন্ধকার রাত্রে মুরশিদাবাদে চলিল। দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল।

সিদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

পূর্ব্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।

যে দিন আমিয়ট ফষ্টরের সহিত মুঙ্গের হইতে যাত্রা করিলেন, সেই দিন সন্ধান করিতে করিতে রমানন্দ স্বামী জানিলেন যে, ফষ্টর ও দলনী বেগম প্রভৃতি একত্রে আমিয়টের সঙ্গে গিয়াছিলেন। গঙ্গাতীরে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ পাইলেন, তাঁহাকে এ সংবাদ অবগত করাইলেন, বলিলেন,—"এখানে তোমার আর থাকিবার প্রয়োজন কি—কিছুই না। তুমি স্বদেশে প্রতিগমন কর। শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাইব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করিয়াছ, অদ্য হইতে তাহার কার্য্য কর। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিত হইয়াছে, তুমি ইহার পশ্চাদনুসরণ কর; যখনই পারিবে, ইহার উদ্ধারের উপায় করিও। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশাগ্রস্ত; তাহাকে এ সময়ে ত্যাগ করিতে পারিবে না। তাহাদের অনুসরণ কর।" চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট সংবাদ দিতে চাহিলেন, স্বামী নিষেধ করিলেন; বলিলেন, "আমি সেখানে সংবাদ দেওয়াইব।" চন্দ্রশেখর গুরুর আদেশে অগত্যা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া আমিয়টের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামীও সেই অবধি, শৈবলিনীকে কাশী পাঠাইবার উদ্যোগে উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অকস্মাৎ জানিলেন যে, শৈবলিনী পৃথক্ নৌকা লইয়া ইংরেজের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। রমানন্দ স্বামী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এ পাপিষ্ঠা কাহার অনুসরণে প্রবৃত্তা হইল?—ফষ্টরের না চন্দ্রশেখরের? রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইল।" এই ভাবিয়া তিনিও সেই পথে চলিলেন।

রমানন্দ স্বামী চিরকাল পদব্রজে দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন-পরিব্রাজক। তিনি তটপথে, পদব্রজে শীঘ্রই শৈবলিনীকে পশ্চাৎ করিয়া আসিলেন,

বিশেষ তিনি আহার-নিদ্রার বশীভূত নহেন, অভ্যাসগুণে সে সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন। ক্রমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে ধরিলেন। চন্দ্রশেখর তীরে রমানন্দ স্বামীকে দেখিয়া তথায় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "একবার নবদ্বীপে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বঙ্গদেশে যাইব অভিলাষ করিয়াছি; চল, তোমার সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের নৌকায় উঠিলেন।

ইংরেজের বহর দেখিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্র তরণী নিভৃতে রাখিয়া তীরে উঠিলেন। দেখিলেন, শৈবলিনীর নৌকা আসিয়াও নিভৃতে রহিল; তাঁহারা দুই জনে তীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রতাপ-শৈবলিনী সাঁতার দিয়া পলাইল। দেখিলেন, তাহারা নৌকায় উঠিয়া পলাইল। তখন তাঁহারাও নৌকায় উঠিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন; তাহারা নৌকা লাগাইল দেখিয়া তাঁহারাও কিছুদূরে নৌকা লাগাইলেন। রমানন্দ স্বামী অনন্তবুদ্ধিশালী—চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "সাঁতার দিবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হইতেছিল, কিছু শুনিতে পাইয়াছিলে?"

চ। না।

র। তবে অদ্য রাত্রে নিদ্রা যাইও না, উহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

উভয়ে জাগিয়া রহিলেন। দেখিলেন, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হইতে উঠিয়া [illegible] ক্রমে তীরবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইল। প্রভাত হয়, তথাপি [illegible] তখন রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, ইহার মনে কি আছে। চল, উহার অনুসরণ করি।"

তখন উভয়ে সতর্কভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত?"

চন্দ্রশেখর, হাসিয়া, একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "উত্তম। শৈবলিনীর নিকট গিয়া অন্তরালে বসিয়া থাক, শৈবলিনী আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পাইলে স্ত্রীহত্যা হইবে। নিকটে এক গুহা আছে, আমি তাহার পথ চিনি। আমি যখন বলিব, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিও।

চ। এখনই ঘোরতর অন্ধকার হইবে, পথ দেখিব কি প্রকারে?

র। আমি নিকটেই থাকিব। আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দিব। অপর ভাগ আমার হস্তে থাকিবে।

শৈবলিনীকে গুহায় রাখিয়া, চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিলে, রমানন্দ স্বামী মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এতকাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?" এই ভাবিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেইখানে অদ্য গিয়া বিশ্রাম কর। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হইলে তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ করিবে। মনে জানিও, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করিও না, আমি এখানে রহিলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না। তুমি যদি আমার মতে কার্য্য কর, তবে শৈবলিনীর পরমোপকার হইতে পারে।"

এই কথার পর চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন। রমানন্দ স্বামী তাহার পর, অন্ধকারে, অলক্ষ্যে, গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহার পর যাহা ঘটিল, পাঠক সকলই জানেন।

উন্মাদগ্রস্ত শৈবলিনীকে চন্দ্রশেখর সেই মঠে রমানন্দ স্বামীর নিকটে লইয়া গেলেন। কাঁদিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! এ কি করিলে?"

রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীর অবস্থা সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। চিন্তা করিও না। তুমি এইখানে দুই এক দিন বিশ্রাম কর। পরে ইহাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে লইয়া যাও। যে গৃহে ইনি বাস করিতেন, সেই গৃহে ইহাকে রাখিও। যাঁহারা ইহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদি[illegible] সর্ব্বদা ইহার কাছে থাকিতে অনুরোধ করিও। প্রতাপকেও সেখানে [illegible] আসিতে বলিও। আমি পশ্চাৎ যাইতেছি।"

গুরুর আদেশ মত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে আনিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুকুম

ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীর কাসেমের অধঃপতন আরম্ভ হইল। মীর কাসেম প্রথমেই কাটোয়ার যুদ্ধে হারিলেন। তাহার পর গুর্‌গন্ খাঁর অবিশ্বাসিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবাবের যে ভরসা ছিল, সে ভরসা নির্ব্বাণ হইল। নবাবের এই সময়ে বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। বন্দী ইংরেজদিগকে বধ

করিবার মানস করিলেন। অন্যান্য সকলের প্রতি অহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহম্মদ তকির প্রেরিত দলনীর সম্বাদ পৌঁছিল। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ইংরেজেরা অবিশ্বাসী হইয়াছে—সেনাপতি অবিশ্বাসী বোধ হইতেছে—রাজ্যলক্ষ্মী বিশ্বাসঘাতিনী—আবার দলনীও বিশ্বাসঘাতিনী? আর সহিল না। মীর কাসেম মহম্মদ তকিকে লিখিলেন, "দলনীকে এখানে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে সেইখানে বিষপান করাইয়া বধ করিও।"

মহম্মদ তকি স্বহস্তে বিষের পাত্র লইয়া দলনীর নিকটে গেল। মহম্মদ তকিকে তাঁহার নিকটে দেখিয়া দলনী বিস্মিতা হইলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কি খাঁ সাহেব। আমাকে বেইজ্জৎ করিতেছেন কেন?"

মহম্মদ তকি কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "কপাল! নবাব আপনার প্রতি অপ্রসন্ন!"

দলনী হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল?"

মহম্মদ তকি বলিলেন, "না বিশ্বাস করেন, পরওয়ানা দেখুন।"

দ। তবে আপনি পরওয়ানা পড়িতে পারেন নাই।

মহম্মদ তকি দলনীকে নবাবের সহিমোহরের পরওয়ানা পড়িতে দিলেন। দলনী পরওয়ানা পড়িয়া, হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "এ জাল। আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন? মরিবে সেই জন্য?"

মহ। আপনি ভীতা হইবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করিতে পারি।

দ। ও হো! তোমার কিছু মতলব আছে। তুমি জাল পরওয়ান লইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ?

মহ। তবে শুনুন। আমি নবাবকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আমিয়টের নৌকায় তাহার উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম আসিয়াছে।

শুনিয়া দলনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। স্থিরবারিশালিনী ললাট-গঙ্গায় তরঙ্গ উঠিল—ভ্রূধনুতে চিন্তা-গুণ দিল—মহম্মদ তকি মনে মনে প্রমাদ গণিল। দলনী বলিলেন, "কেন লিখিয়াছিলে?" মহম্মদ তকি আনুপূর্ব্বিক আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিল।

তখন দলনী বলিলেন, "দেখি, পরওয়ানা আবার দেখি।"

মহম্মদ তকি পরওয়ানা আবার দলনীর হস্তে দিল। দলনী বিশেষ করিয়া দেখিলেন, যথার্থ বটে। জাল নহে। "কই বিষ?"

"কই বিষ?" শুনিয়া মহম্মদ তকি বিস্মিত হইল। বলিল, "বিষ কেন?"

দ। পরওয়ানায় কি হুকুম আছে ?

মহ। আপনারে বিষপান করাইতে।

দ। তবে কই বিষ ?

মহ। আপনি বিষপান করিবেন না কি ?

দ। আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না ?

মহম্মদ তকি মর্ম্মের ভিতর লজ্জায় মরিয়া গেল। বলিল, "যাহা হইয়াছে, হইয়াছে। আপনাকে বিষপান করিতে হইবে না। আমি ইহার উপায় করিব।"

দলনীর চক্ষু হইতে ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সেই ক্ষুদ্র দেহ উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া দলনী বলিলেন, "যে তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমার অপেক্ষাও অধম—বিষ আন।"

মহম্মদ তকি দলনীকে দেখিতে লাগিল। সুন্দরী—নবীনা—সবে মাত্র যৌবন-বর্ষায় রূপের নদী পুরিয়া উঠিতেছে—ভরা বসন্তে অঙ্গ-মুকুল সব ফুটিয়া উঠিয়াছে বসন্ত বর্ষায় একত্রে মিশিয়াছে। যাকে দেখিতেছি—সে দুঃখে ফাটিতেছে—কিন্তু আমার দেখিয়া কত সুখ! জগদীশ্বর! দুঃখ এত সুন্দর করিয়াছ কেন? এই যে কাতরা বালিকা—বাত্যাতাড়িত, প্রস্ফুটিত কুসুম—তরঙ্গোৎপীড়িতা প্রমোদ-নৌকা —ইহাকে লইয়া কি করিব—কোথায় রাখিব ? সয়তান আসিয়া তকির কানে কানে বলিল,—"হৃদয়-মধ্যে।"

তকি বলিল, "শুন সুন্দরী—আমাকে ভজ—বিষ খাইতে হইবে না।"

শুনিয়া দলনী—লিখিতে লজ্জা করে—মহম্মদ তকিকে পদাঘাত করিলেন।

মহম্মদ তকির বিষ দান করা হইল না—মহম্মদ তকি দলনীর প্রতি, অর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল।

তখন দলনী মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ও রাজরাজেশ্বর! শাহান্‌শাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ? বিষ খাইব ? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না! তোমার আদরই আমার অমৃত —তোমর ক্রোধই আমার বিষ। তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে ? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।

করিমন নামে এক জন পরিচারিকা দলনী বেগমের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল

তাহাকে ডাকিয়া, দলনী আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার তাহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "লুকাইয়া হকিমের নিকট হইতে আমাকে এমত ঔষধ আনিয়া দাও, যেন আমার নিদ্রা আসে—সে নিদ্রা আর না ভাঙ্গে। মূল্য এই অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া দিও। বাকি যাহা থাকে, তুমি লইও।"

করিমন দলনীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া বুঝিল। প্রথমে সে সম্মত হইল না—দলনী পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। শেষে মূর্খ লুব্ধ স্ত্রীলোক, অধিক অর্থের লোভে স্বীকৃত হইল।

হকিম ঔষধ দিল। মহম্মদ তকির নিকট হরকরা আসিয়া গোপনে সম্বাদ দিল,— "করিমন বাঁদী আজ এই মাত্র হকিম মেরজা হবীবের নিকট হইতে বিষ ক্রয় করিয়া আনিয়াছে।"

মহম্মদ তকি করিমনকে ধরিলেন। করিমন স্বীকার করিল। বলিল, "বিষ দলনী বেগমকে দিয়াছি।"

মহম্মদ তকি শুনিয়াই দলনীর নিকট আসিলেন। দেখিলেন, দলনী আসনে উর্দ্ধমুখে, উর্দ্ধদৃষ্টিতে, যুক্তকরে বসিয়া আছে—বিস্ফারিত পদ্মপলাশ চক্ষু হইতে জলধারার পর জলধারা গণ্ড বহিয়া বস্ত্রে আসিয়া পড়িতেছে—সম্মুখে শূন্য পাত্র পড়িয়া আছে—দলনী বিষপান করিয়াছে।

মহম্মদ তকি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পাত্র পড়িয়া আছে?"

দলনী বলিলেন, "ও বিষ। আমি তোমার মত নিমকহারাম নহি—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া থাকি। তোমার উচিত—অবশিষ্ট পান করিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

মহম্মদ তকি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট্ ও বরাট

মীর কাশেমের সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়া হটিয়া আসিয়াছিল। ভাঙ্গা কপাল গিরিয়ার ক্ষেত্রে আবার ভাঙ্গিল—আবার যবনসেনা, ইংরেজের বাহুবলে, বায়ুর নিকট ধূলিরাশির ন্যায় তাড়িত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। ধ্বংসাবশিষ্ট

সৈন্যগণ আসিয়া উদয়নালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় চতুঃপার্শ্বে খাদ প্রস্তুত করিয়া যবনেরা ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতেছিলেন।

মীর কাশেম স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিলে, সৈয়দ আমীর হোসেন একদা জানাইল যে, এক জন বন্দী তাঁহার দর্শনার্থ বিশেষ কাতর। তাহার কোন বিশেষ নিবেদন আছে—হজুরে নহিলে তাহা প্রকাশ করিবে না।

মীর কাশেম জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কে ?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "এক জন স্ত্রীলোক—কলিকাতা হইতে আসিয়াছে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেব পত্র লিখিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে বাস্তবিব বন্দী নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বের পত্র বলিয়া অধীন তাহা গ্রহণ করিয়াছে। অপরা হইয়া থাকে, গোলাম হাজির আছে।" এই বলিয়া আমীর হোসেন পত্র পড়িয় নবাবকে শুনাইলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ লিখিয়াছিলেন, "এ স্ত্রীলোক কে, তাহা আমি চিনি না, সে নিতান্ত কাতর হইয়া আমার নিকটে আসিয়া মিনতি করিল যে, কলিকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিই, তবে সে রক্ষা পায় আপনাদিগের সঙ্গে আমাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না। এ জন্য ইহাকে আপনার নিকট পাঠাইলাম ভাল মন্দ কিছু জানি না।"

নবাব পত্র শুনিয়া, স্ত্রীলোককে সম্মুখে আসিতে অনুমতি দিলেন। সৈয়দ আমীর হোসেন বাহিরে গিয়া ঐ স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিলেন—নবাব দেখিলেন—কুল্‌সম্।

নবাব রুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি চাহিস বাঁদী—মরিবি— ?"

কুল্‌সম্ নবাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কহিল, "নবাব! তোমার বেগম কোথায়! দলনী বিবি কোথায়!" আমীর হোসেন কুল্‌সমের বাক্যপ্রণালী দেখিয়া ভীত হইল এবং নবাবকে অভিবাদন করিয়া সরিয়া গেল।

মীর কাসেম বলিলেন, "যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেইখানে শীঘ্র যাইবে।"

কুল্‌সম্ বলিল, "আমিও, আপনিও। তাই আপনার কাছে অসিয়াছি। পথে শুনিলাম, লোক রটাইতেছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করিয়াছে। সত্য কি ?"

নবাব। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরিয়াছে। তুই তাহার দুষ্কর্ম্মের সহায়—তুই কুকুরের দ্বারা ভুক্ত হইবি—

কুল্‌সম্ আছড়াইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং যাহা মুখে আসিল, তাহ

বলিয়া নবাবকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। শুনিয়া চারি দিক্ হইতে সৈনিক, ওমরাহ, ভৃত্য, রক্ষক প্রভৃতি আসিয়া পড়িল—এক জন কুল্‌সমের চুল ধরিয়া তুলিতে গেল। নবাব নিষেধ করিলেন—তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে সরিয়া গেল। তখন কুল্‌সম্ বলিতে লাগিল, "আপনারা সকলে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব, শুনুন। আমার এক্ষণই বধাজ্ঞা হইবে—আমি মরিলে আর কেহ তাহা শুনিতে পাইবে না। এই সময় শুনুন।"

"শুনুন, সুবে বাঙ্গালা বেহারের, মীর কাসেম নামে, এক মূর্খ নবাব আছে। দলনী নামে তাহার বেগম ছিল। সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গন্ খাঁর ভগিনী।"

শুনিয়া কেহ আর কুল্‌সমের উপর আক্রমণ করিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল—সকলেরই কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। নবাবও কিছু বলিলেন না—কুল্‌সম বলিতে লাগিল, "গুর্‌গন্ খাঁ ও দৌলত উন্নেছা ইস্পাহান হইতে পরামর্শ করিয়া জীবিকান্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীর কাসেমের গৃহে বাঁদীস্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।"

কুল্‌সম্ তাহার পরে, যে রাত্রে তাহারা দুই জনে গুর্‌গন্ খাঁর ভবনে গমন করে, তদ্বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিল। গুর্‌গন্ খাঁর সঙ্গে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা দলনীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহাও বলিল। তৎপরে, প্রত্যাবর্ত্তন, আর নিষেধ, ব্রহ্মচারীর সাহায্য, প্রতাপের গৃহে অবস্থিতি, ইংরেজগণকৃত আক্রমণ এবং শৈবলিনী-ভ্রমে দলনীরে হরণ, নৌকায় কারাবাস, আমিয়ট প্রভৃতির মৃত্যু, ফষ্টরের সহিত তাহাদিগের পলায়ন, শেষে দলনীকে গঙ্গাতীরে ফষ্টরকৃত পরিত্যাগ, এ সকল বলিয়া শেষে বলিতে লাগিল, "আমার স্কন্ধে সেই সময় সয়তান চাপিয়াছিল সন্দেহ নাই, নহিলে আমি সে সময়ে বেগমকে কেন পরিত্যাগ করিব? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি—মনে করিয়াছিলাম—সে কথা যাউক। মনে করিয়াছিলাম, নিজামতের নৌকা পশ্চাৎ আসিতেছে—বেগমকে তুলিয়া লইবে—নহিলে আমি তাহাকে ছাড়িব কেন? কিন্তু তাহার যোগ্য শাস্তি আমি পাইয়াছি—বেগমকে পশ্চাৎ করিয়াই আমি কাতর হইয়া ফষ্টরকে সাধিয়াছি যে, আমাকেও নামাইয়া দাও—সে নামাইয়া দেয় নাই। কলিকাতায় গিয়া যাহাকে দেখিয়াছি—তাহাকেই সাধিয়াছি যে, আমাকে পাঠাইয়া দাও—কেহ কিছু বলে নাই। শুনিলাম, হেষ্টিং সাহেব বড় দয়ালু—তাঁহার কাছে কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিলাম—তাঁহারই কৃপায় আসিয়াছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর—আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই।"

এই বলিয়া কুল্‌সম্‌ কাঁদিতে লাগিল।

বহুমূল্য সিংহাসনে, শত শত রশ্মি প্রতিঘাতী রত্নরাজির উপরে বসিয়া, বাঙ্গালার নবাব,—অধোবদনে। এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে ত স্খলিত হইয়া পড়িতেছে—বহু যত্নেও ত রহিল না। কিন্তু যে অজেয় রাজ্য, বিনা যত্নে থাকিত—সে কোথায় গেল! তিনি কুসুম ত্যাগ করিয়া কণ্টকে যত্ন করিয়াছেন—কুল্‌সম্‌ সত্যই বলিয়াছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ!

নবাব ওমরাহদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা শুন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নহে। এই বাঁদী যাহা বলিল, তাহা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুবা রক্ষা কর, আমি চলিলাম। আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব, অথবা ফকিরি গ্রহণ করিব"—বলিতে বলিতে নবাবের বলিষ্ঠ শরীর, প্রবাহমধ্যে রোপিত বংশখণ্ডের ন্যায় কাঁপিতেছিল—চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া মীর কাসেম বলিতে লাগিলেন,—"শুন বন্ধুবর্গ! যদি আমাকে সেরাজউদ্দৌলার ন্যায়, ইংরেজে বা তাহাদের অনুচর মারিয়া ফেলে, তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমার কবর দিও। আর আমি কথা কহিতে পারি না—এখন যাও। কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর—আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখিব—আলি ইব্রাহিম খাঁ?"

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিলেন। নবাব বলিলেন, "তোমার ন্যায় আমার বন্ধু জগতে নাই—তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—তকি খাঁকে আমার কাছে লইয়া আইস।"

ইব্রাহিম খাঁ অভিবাদন করিয়া, তাম্বুর বাহিরে গিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

নবাব তখন বলিলেন, "আর কেহ আমার উপকার করিবে?"

সকলেই যোড়হাত করিয়া হুকুম চাহিল। নবাব বলিলেন, "কেহ সেই ফষ্টরকে আনিতে পার?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "সে কোথায় আছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে কলিকাতায় চলিলাম।"

নবাব ভাবিয়া বলিলেন, "আর সেই শৈবলিনী কে? তাহাকে কেহ আনিতে পারিবে?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ যুক্তকরে নিবেদন করিল, "অবশ্য এত দিন সে দেশে আসিয়া থাকিবে, আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ বিদায় হইল।

তাহার পরে নবাব বলিলেন, "যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাঁহার কেহ সন্ধান করিতে পার ?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্ বলিল, "হুকুম হইলে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গের যাইতে পারি।"

শেষ কাসেম আলি বলিলেন, "গুর্‌গন্ খাঁ কত দূর ?"

অমাত্যবর্গ বলিলেন, "তিনি ফৌজ লইয়া উদয়নালায় আসিতেছেন শুনিয়াছি—কিন্তু এখনও পৌঁছেন নাই।"

নবাব মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন, "ফৌজ ! ফৌজ ! কাহার ফৌজ !"

এক জন কে চুপি চুপি বলিলেন,—"তাঁরি !"

অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্নসিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, হীরকখচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন।—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী ! দলনী !' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এ সংসারে নবাবি এইরূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্ ষ্ট্যালকার্ট

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কুল্‌সমের সঙ্গে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কুল্‌সম্ আত্মবিবরণ সবিস্তারে কহিতে গিয়া, ফষ্টরের কার্য্য সকলের সবিশেষ পরিচয় দিল।

ইতিহাসে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ পরপীড়ক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কর্ম্মঠ লোক কর্ত্তব্যানুরোধে অনেক সময়ে পরপীড়ক হইয়া উঠে। যাহার উপর রাজ্য-রক্ষার ভার, তিনি স্বয়ং দয়ালু এবং ন্যায়পর হইলেও রাজ্য রক্ষার্থ পরপীড়ন করিতে বাধ্য হন। যেখানে দুই এক জনের উপর অত্যাচার করিলে, সমুদয় রাজ্যের উপকার হয়, সেখানে তাঁহারা মনে করেন যে, সে অত্যাচার করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যাঁহারা ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের ন্যায় সাম্রাজ্য-সংস্থাপনে সক্ষম, তাঁহারা যে দয়ালু এবং ন্যায়নিষ্ঠ নহেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহার প্রকৃতিতে দয়া এবং ন্যায়পরতা নাই—তাঁহার দ্বারা রাজ্য-স্থাপনাদি মহৎ কার্য্য হইতে পারে না—কেন না, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত নহে—ক্ষুদ্র। এ সকল ক্ষুদ্রচেতার কাজ নহে।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। তখন তিনি গবর্ণর হন নাই। কুল্‌সম্‌কে বিদায় করিয়া তিনি ফষ্টরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, ফষ্টর পীড়িত। প্রথমে তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। ফষ্টর উৎকৃষ্ট চিকিৎসকের চিকিৎসায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিল।

তাহার পরে, তাহার অপরাধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীত হইয়া, ফষ্টর তাঁহার নিকট অপরাধ স্বীকার করিল। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কৌন্সিলে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ফষ্টরকে পদচ্যুত করিলেন। হেষ্টিংসের ইচ্ছা ছিল যে, ফষ্টরকে বিচারালয়ে উপস্থিত করেন; কিন্তু সাক্ষীদিগের কোন সন্ধান নাই, এবং ফষ্টরও নিজকার্য্যের অনেক ফল ভোগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাতে বিরত হইলেন।

ফষ্টর তাহা বুঝিল না। ফষ্টর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাশয়। সে মনে করিল, তাহার লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইয়াছে। সে ক্ষুদ্রাশয়, অপরাধী ভৃত্যদিগের স্বভাবানুসারে পূর্ব্বপ্রভু দিগের প্রতি বিশেষ কোপাবিষ্ট হইল। তাহাদিগের বৈরিতাসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

ডাইস্ সম্বর নামে এক জন সুইস্ বা জর্ম্মান মীর কাসেমের সেনাদলমধ্যে সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এই ব্যক্তি সমরু নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। উদয় নালায় যবন-শিবিরে সমরু সৈন্য লইয়া উপস্থিত ছিল। ফষ্টর উদয়নালায় তাহার নিকট আসিল। প্রথমে কৌশলে সমরুর নিকট দূত প্রেরণ করিল। সমরু মনে ভাবিল, ইহার দ্বারা ইংরেজদিগের গুপ্ত মন্ত্রণা সকল জানিতে পারিব। সমরু ফষ্টরকে গ্রহণ করিল। ফষ্টর আপন নাম গোপন করিয়া, জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া সমরুর শিবিরে প্রবেশ করিল। যখন আমীর হোসেন ফষ্টরের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, তখন লরেন্স ফষ্টর সমরুর তাম্বুতে।

আমীর হোসেন, কুল্‌সম্‌কে যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া, ফষ্টরের অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন। অনুচরবর্গের নিকট শুনিলেন যে, এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে, এক জন ইংরেজ আসিয়া মুসলমান সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। সে সমরুর শিবিরে আছে। আমীর হোসেন সমরুর শিবিরে গেলেন।

যখন আমীর হোসেন সমরুর তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন, তখন সমরু ও ফষ্টর একত্রে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। আমীর হোসেন আসন গ্রহণ করিলে সমরু জন্ ষ্ট্যালকার্ট বলিয়া তাঁহার নিকট ফষ্টরের পরিচয় দিলেন। আমীর হোসেন ষ্ট্যাল কার্টের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমীর হোসেন, অন্যান্য কথার পর ষ্ট্যালকার্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লরেন্স ফষ্টর নামক এক জন ইংরেজকে আপনি চিনেন?"

ফষ্টরের মুখ রক্তবর্ণ হইয়া গেল। সে মৃত্তিকাপানে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ বিকৃত-কণ্ঠে কহিল, "লরেন্স ফষ্টর? কই—না।"

আমীর হোসেন, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন তাহার নাম শুনিয়াছেন?"

ফষ্টর কিছু বিলম্ব করিয়া উত্তর করিল,—"নাম—লরেন্স ফষ্টর—হাঁ—কই? না।"

আমীর হোসেন আর কিছু বলিলেন না, অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ষ্ট্যাল্‌কার্ট আর ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না। দুই একবার উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমীর হোসেন অনুরোধ করিয়া তাহাকে বসাইলেন। আমীর হোসেনের মনে মনে হইতেছিল যে, এ ফষ্টরের কথা জানে, কিন্তু বলিতেছে না।

ফষ্টর কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার টুপী লইয়া মাথায় দিয়া বসিল। আমার হোসেন জানিতেন যে, এটি ইংরেজদিগের নিয়মবহির্ভূত কাজ। আরও, যখন ফষ্টর টুপী মাথায় দিতে যায়, তখন তাহার শিরস্থ কেশশূন্য আঘাত-চিহ্নের উপর দৃষ্টি পড়িল। ষ্ট্যাল্‌কার্ট কি আঘাত-চিহ্ন ঢাকিবার জন্য টুপী মাথায় দিল!

আমীর হোসেন বিদায় হইলেন। আপন শিবিরে আসিয়া কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন; তাহাকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।" কুল্‌সম্‌ তাঁহার সঙ্গে গেল।

কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে লইয়া আমীর হোসেন পুনর্ব্বার সমরুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। কুল্‌সম্‌ বাহিরে রহিল। ফষ্টর তখনও সমরুর তাম্বুতে বসিয়াছিল। আমীর হোসেন সমরুকে বলিলেন, "যদি আপনার অনুমতি হয়, তবে আমার এক জন বাঁদী আসিয়া আপনাকে সেলাম করে। বিশেষ কার্য্য আছে।"

সমরু অনুমতি দিলেন। ফষ্টরের হৃৎকম্প হইল—সে গাত্রোত্থান করিল। আমীর হোসেন হাসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইলেন। কুল্‌সম্‌কে ডাকিলেন। কুল্‌সম্‌ আসিল। ফষ্টরকে দেখিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল।

আমীর হোসেন কুল্‌সম্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ?"

কুল্‌সম্‌ বলিল, "লরেন্স ফষ্টর।"

আমীর হোসেন ফষ্টরের হাত ধরিলেন। ফষ্টর বলিল, "আমি কি করিয়াছি?"

আমীর হোসেন তাহার কথার উত্তর না দিয়া সমরুকে বলিলেন, "সাহেব! ইহার গ্রেপ্তারীর জন্য নবাব নাজিমের অনুমতি আছে। আপনি আমার সঙ্গে সিপাহী দিন, ইহাকে লইয়া চলুক।"

সমরু বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৃত্তান্ত কি?"

আমীর হোসেন বলিলেন, "পশ্চাৎ বলিব।" সমরু সঙ্গে প্রহরী দিলেন, আমীর হোসেন ফষ্টরকে বাঁধিয়া লইয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবার বেদগ্রামে

বহুকষ্টে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে স্বদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন।

বহুকাল পরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সে গৃহ তখন অরণ্যাধিক ভীষণ হইয়া আছে। চালে প্রায় খড় নাই—প্রায় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে ; কোথায় বা চাল পড়িয়া গিয়াছে—গোরুতে খড় খাইয়া গিয়াছে—বাঁশবাখারী পাড়ার লোকে পোড়াইতে লইয়া গিয়াছে। উঠানে নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে—উরগজাতি নির্ভয়ে তন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। ঘরের কপাটসকল চোরে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। ঘর খোলা—ঘরে দ্রব্যসামগ্রী কিছুই নাই, কতক চোরে লইয়া গিয়াছে—কতক সুন্দরী আপন গৃহে লইয়া গিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। ঘরে বৃষ্টি প্রবেশ করিয়া জল বসিয়াছে। কোথাও পচিয়াছে, কোথাও ছাতা ধরিয়াছে। ইন্দুর, আরসুলা, বাদুড় পালে পালে বেড়াইতেছে। চন্দ্রশেখর, শৈবলিনীর হাত ধরিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নিরীক্ষণ করিলেন যে, ঐখানে দাঁড়াইয়া, পুস্তকরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি।"

শৈবলিনী কথা কহিল না ; কক্ষদ্বারে বসিয়া পূর্ব্বস্বপ্নদৃষ্ট করবীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিল। চন্দ্রশেখর যত কথা কহিলেন, কোন কথার উত্তর দিল না—বিস্ফারিত-লোচনে চারি দিক্ দেখিতেছিল—একটু একটু টিপি টিপি হাসিতেছিল—একবার স্পষ্ট হাসিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা কি দেখাইল।

এদিকে পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র হইল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া আসিয়াছেন। অনেকে দেখিতে আসিতেছিল। সুন্দরী সর্ব্বাগ্রে আসিল।

সুন্দরী শৈবলিনীর ক্ষিপ্তাবস্থার কথা কিছু শুনে নাই। প্রথমে আসিয়া চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল। দেখিল, চন্দ্রশেখরের ব্রহ্মচারীর বেশ। প্রতি চাহিয়া বলিল, "তা, ওকে এনেছ, বেশ করেছ। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই হইল।" কিন্তু সুন্দরী দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, চন্দ্রশেখর রহিয়াছে, তবু শৈবলিনী সরিলও না,

ঘোমটাও টানিল না, বরং সুন্দরীর পানে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। সুন্দরী ভাবিল, "এ বুঝি ইংরেজী ধরণ, শৈবলিনী ইংরেজের সংসর্গে শিখিয়া আসিয়াছে!" এই ভাবিয়া শৈবলিনীর কাছে গিয়া বসিল—একটু তফাৎ রহিল, কাপড়ে কাপড়ে না ঠেকে। হাসিয়া শৈবলিনীকে বলিল, "কি লা, চিনতে পারিস্?"

শৈবলিনী বলিল, "পারি—তুই পার্ব্বতী।"

সুন্দরী বলিল, "মরণ আর কি, তিন দিনে ভুলে গেলি?"

শৈবলিনী বলিল, "ভুলব কেন লো—সেই যে তুই আমার ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিলি বলিয়া, আমি তোকে মেরে গুঁড়ানাড়া কল্লুম। পার্ব্বতী দিদি একটি গীত গা না?

আমার মরম কথা তাই লো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ?
মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাইনে পার্ব্বতী দিদি—কে যেন নেই—কে যেন ছিল, সে যেন নেই—কে যেন আস্‌বে,—সে যেন আসে না—কোথা যেন এয়েছি, সেখানে যেন আসি নাই—কাকে যেন খুঁজি, তাকে যেন চিনি না।"

সুন্দরী বিস্মিতা হইল—চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিল—চন্দ্রশেখর সুন্দরীকে কাছে ডাকিলেন। সুন্দরী নিকটে আসিলে তাহার কর্ণে বলিলেন, "পাগল হইয়া গিয়াছে।"

সুন্দরী তখন বুঝিল। কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। সুন্দরীর চক্ষু প্রথমে চক্‌চকে হইল, তার পরে পাতার কোলে ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল, শেষ জলবিন্দু ঝরিল—সুন্দরী কাঁদিতে লাগিল। স্ত্রীজাতিই সংসারের রত্ন! এই সুন্দরী আর এক দিন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিল, শৈবলিনী যেন নৌকাসহিত জলমগ্ন হইয়া মরে। আজি সুন্দরীর ন্যায় শৈবলিনীর জন্য কেহ কাতর নহে।

সুন্দরী আসিয়া ধীরে ধীরে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে শৈবলিনীর কাছে বসিল—ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিল—ধীরে ধীরে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে লাগিল—শৈবলিনী কিছু স্মরণ করিতে পারিল না। শৈবলিনীর স্মৃতির বিলোপ ঘটে নাই—তাহা হইলে পার্ব্বতী নাম মনে পড়িবে কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা মনে পড়ে না—বিকৃত হইয়া, বিপরীতে বিপরীত সংলগ্ন হইয়া মনে আসে। সুন্দরীকে মনে ছিল, কিন্তু সুন্দরীকে চিনিতে পারিল না।

সুন্দরী, প্রথমে চন্দ্রশেখরকে আপনাদিগের গৃহে স্নানাহারের জন্য পাঠাইলেন;

পরে সেই ভগ্নগৃহ শৈবলিনীর বাসোপযোগী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে, প্রতিবাসিনীরা একে একে আসিয়া তাঁহার সাহায্যে প্রবৃত্ত হইল; আবশ্যক সামগ্রী সকল আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এদিকে প্রতাপ মুঙ্গের হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, লাঠিয়াল সকলকে যথাস্থানে সমাবেশ করিয়া একবার গৃহে আসিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, চন্দ্রশেখর গৃহে আসিয়াছেন। ত্বরায় তাঁহাকে দেখিতে বেদগ্রামে আসিলেন।

সেই দিন রমানন্দ স্বামীও সেই স্থানে পূর্ব্বে আসিয়া দর্শন দিলেন। আহ্লাদ-সহকারে সুন্দরী শুনিলেন যে, রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন। ঔষধ প্রয়োগের শুভলগ্ন অবধারিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যোগবল না PSYCHIC FORCE?

ঔষধ কি, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা সেবন করাইবার জন্য, চন্দ্রশেখর বিশেষরূপে আত্মশুদ্ধি করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সহজে জিতেন্দ্রিয়, ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল অন্যাপেক্ষা তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার উপরে কঠোর অনশন-ব্রত আচরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। মনকে কয়দিন হইতে ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন—পরমার্থিক চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পায় নাই।

অবধারিতকালে চন্দ্রশেখর ঔষধপ্রয়োগার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শৈবলিনীর জন্য, শয্যা রচনা করিতে বলিলেন; সুন্দরীর নিযুক্তা পরিচারিকা শয্যা রচনা করিয়া দিল।

চন্দ্রশেখর তখন সেই শয্যায় শৈবলিনীকে শুয়াইতে অনুমতি করিলেন। সুন্দরী শৈবলিনীকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক শয়ন করাইল—শৈবলিনী সহজে কথা শুনে না। সুন্দরী গৃহে গিয়া স্নান করিবে—প্রত্যহ করে।

চন্দ্রশেখর তখন সকলকে বলিলেন, "তোমরা একবার বাহিরে যাও। আমি ডাকিবামাত্র আসিও।"

সকলে বাহিরে গেলে, চন্দ্রশেখর করস্থ ঔষধপাত্র মাটিতে রাখিলেন। শৈবলিনীকে বলিলেন, "উঠিয়া ব'স দেখি।"

শৈবলিনী, মৃদু মৃদু গীত গায়িতে লাগিল—উঠিল না। চন্দ্রশেখর স্থির দৃষ্টিতে তাহার নয়নের প্রতি নয়ন স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে গণ্ডূষ গণ্ডূষ করিয়া এক পাত্র হইতে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, "ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।" চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইহাতে কি হইবে ?" স্বামী বলিয়াছিলেন, "কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।"

তখন চন্দ্রশেখর তাহার ললাট, চক্ষু প্রভৃতির নিকট নানা প্রকার বক্রগতিতে হস্ত-সঞ্চালন করিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ করিতে করিতে শৈবলিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিল, অচিরাৎ শৈবলিনী ঢুলিয়া পড়িল—ঘোর নিদ্রাভিভূত হইল।

তখন চন্দ্রশেখর ডাকিলেন, "শৈবলিনি !"

শৈবলিনী, নিদ্রাবস্থায় বলিল, "আজ্ঞে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি কে ?"

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ নিদ্রিতা—কহিল, "আমার স্বামী।"

চ। তুমি কে ?

শৈ। শৈবলিনী।

চ। এ কোন্ স্থান ?

শৈ। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চ। বাহিরে কে কে আছে ?

শৈ। প্রতাপ ও সুন্দরী এবং অন্যান্য ব্যক্তি।

চ। তুমি এখান হইতে গিয়াছিলে কেন ?

শৈ। ফষ্টর সাহেব লইয়া গিয়াছিল বলিয়া।

চ। এ সকল কথা এতদিন তোমার মনে পড়ে নাই কেন ?

শৈ। মনে ছিল—ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিলাম না।

চ। কেন ?

শৈ। আমি পাগল হইয়াছি।

চ। সত্য সত্য, না কাপট্য আছে ?

শৈ। সত্য সত্য, কাপট্য নাই।

চ। তবে এখন ?

শৈ। এখন এ যে স্বপ্ন—আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

চ। তবে সত্য কথা বলিবে ?

শৈ। বলিব।

চ। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য।

চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্রচক্ষে বিগত ঘটনা সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?"

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধিতে কিছু লুক্কায়িত রহিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা হইতে পলাইল, সে দিনে, গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে?"

শৈ। পড়ে।

চ। কি কি কথা হইয়াছিল?

শৈবলিনী সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া চন্দ্রশেখর মনে মনে প্রতাপকে অনেক সাধুবাদ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?"

শৈ। বাসমাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাসমাত্র—তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—এজন্য আমি সাধ্বী নহি—মহা পাপিষ্ঠা।

চ। নচেৎ?

শৈ। নচেৎ সম্পূর্ণ সতী।

চ। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈ। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্রশেখর খর খর দৃষ্টি করিয়া, হস্ত-সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, "সত্য বল।"

নিদ্রিতা যুবতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল, "সত্যই বলিয়াছি।"

চন্দ্রশেখর আবার নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, "তবে ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া জাতিভ্রষ্টা হইতে গেলে কেন?"

শৈ। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী। বলুন, আমি জাতিভ্রষ্টা কি না? আমি তাহার

অন্ন খাই নাই—তাহার স্পৃষ্ট জলও খাই নাই। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছি। হিন্দু পরিচারিকায় আয়োজন করিয়া দিয়াছে। এক নৌকায় বাস করিয়াছি বটে—কিন্তু গঙ্গার উপর।

চন্দ্রশেখর অধোবদন হইয়া বসিলেন ;—অনেক ভাবিলেন—বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি—স্ত্রীহত্যা করিতে বসিয়াছিলাম।" ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল কথা কাহাকেও বল নাই কেন?"

শৈ। আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

চ। এ সকল কথা কে জানে?

শৈ। ফষ্টর আর পার্ব্বতী।

চ। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈ। মাসাবধি হইল মুঙ্গেরে মরিয়া গিয়াছে।

চ। ফষ্টর কোথায়?

শৈ। উদয়নালায়, নবাবের শিবিরে।

চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার রোগের কি প্রতীকার হইবে—বুঝিতে পার?"

শৈ। আপনার যোগবল আমাকে দিয়াছেন—তৎপ্রসাদে জানিতে পারিতেছি—আপনার শ্রীচরণকৃপায়, আপনার ঔষধে আরোগ্য লাভ করিব।

চ। আরোগ্য লাভ করিলে কোথায় যাইতে ইচ্ছা কর।

শৈ। যদি বিষ পাই ত খাই—কিন্তু নরকের ভয় করে।

চ। মরিতে চাও কেন?

শৈ। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চ। কেন, আমার গৃহে?

শৈ। আপনি আর গ্রহণ করিবেন?

চ। যদি করি?

শৈ। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হইবেন।

এই সময়ে দূরে অশ্বের পদশব্দ শুনা গেল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার যোগবল নাই, রমানন্দ স্বামীর যোগবল পাইয়াছ,—বল, ও কিসের শব্দ?"

শৈ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চ। কে আসিতেছে?

শৈ। মহম্মদ ইর্‌ফান্—নবাবের সৈনিক।

চ। কেন আসিতেছে?

শৈ। আমাকে লইয়া যাইবে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।

চ। ফষ্টর সেখানে গেলে পরে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন, না তৎপূর্ব্বে?

শৈ। না। দুই জনকে আনিতে এক সময় আদেশ করেন।

চ। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও।

এই বলিয়া চন্দ্রশেখর সকলকে ডাকিলেন। তাঁহারা আসিলে বলিলেন যে, "এ নিদ্রা যাইতেছে। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, এই পাত্রস্থ ঔষধ খাওয়াইও। সম্প্রতি, নবাবের সৈনিক আসিতেছে—কল্য শৈবলিনীকে লইয়া যাইবে। তোমরা সঙ্গে যাইও।"

সকলে বিস্মিত ও ভীত হইল। চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইহাকে নবাবের নিকট লইয়া যাইবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এখনই শুনিবে, চিন্তা নাই।"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ আসিলে, প্রতাপ তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হইলেন। চন্দ্রশেখর আদ্যোপান্ত সকল কথা রমানন্দ স্বামীর কাছে গোপনে নিবেদিত করিলেন। রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আগামী কল্য আমাদের দুই জনকেই নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দরবারে

বৃহৎ তাম্বুর মধ্যে, বার দিয়া বাঙ্গালার শেষ রাজা বসিয়াছেন—শেষ রাজা, কেন না, মীর কাসেমের পর যাঁহারা বাঙ্গালার নবাব নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ রাজত্ব করেন নাই।

বার দিয়া, মুক্তাপ্রবালরজতকাঞ্চনশোভিত উচ্চাসনে, নবাব কাসেম আলি খাঁ মুক্তাহীরামণ্ডিত হইয়া শিরোদেশে উষ্ণীষোপরে উজ্জ্বলতম সূর্য্যপ্রভ হীরকখণ্ডে রঞ্জিত করিয়া দরবারে বসিয়াছেন। পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, ভৃত্যবর্গ যুক্তহস্তে দণ্ডায়মান—অমাত্যবর্গ অনুমতি পাইয়া জানুর দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া, নীরবে বসিয়া আছেন। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দিগণ উপস্থিত?"

মহম্মদ ইর্‌ফান্‌ বলিলেন, "সকলেই উপস্থিত।"

নবাব, প্রথমে লরেন্স ফষ্টরকে আনিতে বলিলেন।

লরেন্স ফষ্টর আনীত হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লরেন্স ফষ্টর বুঝিয়াছিলেন যে, এবার নিস্তার নাই। এতকালের পর ভাবিলেন, 'এতকাল ইংরেজ নামে কালি দিয়াছি, এক্ষণে ইংরেজের মত মরিব।'

"আমার নাম লরেন্স ফষ্টর।"

নবাব। তুমি কোন্ জাতি?

ফষ্টর। ইংরেজ।

ন। ইংরেজ আমার শত্রু। তুমি শত্রু হইয়া আমার শিবিরে কেন আসিয়াছিলে?

ফ। আসিয়াছিলাম, সেজন্য আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন—আমি আপনার হাতে পড়িয়াছি, কেন আসিয়াছিলাম, তাহা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—জিজ্ঞাসা করিলেও কোন উত্তর পাইবেন না।

নবাব ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিলেন, বলিলেন, "জানিলাম তুমি ভয়শূন্য। সত্য কথা বলিতে পারিবে?"

ফ। ইংরেজ কখনও মিথ্যা কথা বলে না।

ন। বটে? তবে দেখা যাউক। কে বলিযাছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন? থাকেন, তবে তাঁহাকে আন।

মহম্মদ ইর্‌ফান্ চন্দ্রশেখরকে আনিলেন। নবাব চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কহিলেন, "ইঁহাকে চেন?"

ফ। নাম শুনিয়াছি—চিনি না।

ন। ভাল। বাঁদী কুল্‌সম্ কোথায়?

কুল্‌সম্ আসিল; নবাব ফষ্টরকে কহিলেন, "এই বাঁদীকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। কে এ?

ফ। আপনার দাসী।

ন। মহম্মদ তকিকে আন।

তখন মহম্মদ ইর্‌ফান্ তকি খাঁকে বদ্ধাবস্থায় আনীত করিলেন।

তকি খাঁ এতদিন ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কোন্ পক্ষে যাই; এইজন্য শত্রুপক্ষে আজিও মিলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে অবিশ্বাসী জানিয়া নবাবের

সেনাপতিগণ চক্ষে চক্ষে রাখিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁ অনায়াসে তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিয়াছিলেন।

নবাব তকি খাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, "কুল্‌সম্! বল, তুমি মুঙ্গের হইতে কি প্রকারে কলিকাতায় গিয়াছিলে?"

কুল্‌সম্ আনুপূর্ব্বিক সকল বলিল। দলনী বেগমের বৃত্তান্ত সকল বলিল। বলিয়া যোড়হস্তে, সজলনয়নে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"জাঁহাপনা! আমি এই আম দরবারে এই পাপিষ্ঠ স্ত্রীঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ করিতেছি, গ্রহণ করুন! সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করিয়াছে—জাঁহাপনা! পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে অকাতরে হত্যা করুন।"

মহম্মদ তকি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা—তোমার সাক্ষী কে?"

কুল্‌সম্, বিস্ফারিত-লোচনে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমার সাক্ষী! উপরে চাহিয়া দেখ—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে—আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কাহারও কথার প্রয়োজন থাকে, এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর।"

"কেমন, ফিরিঙ্গী, এই বাঁদী যাহা যাহা বলিতেছে, তাহা কি সত্য? তুমিও ত আমিয়টের সঙ্গে ছিলে—ইংরেজ সত্য ভিন্ন বলে না।"

ফষ্টর যাহা জানিত, স্বরূপ বলিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল দলনী অনিন্দনীয়া। তকি অধোবদন হইয়া রহিল।

তখন, চন্দ্রশেখর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য, আমিও তাহার একজন সাক্ষী। আমি সেই ব্রহ্মচারী।"

কুল্‌সম্ তখন চিনিল। বলিল, "ইনিই বটে।"

তখন চন্দ্রশেখর বলিতে লাগিলেন, "রাজন্, যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে উহাকে আর দুই একটা প্রশ্ন করুন।"

নবাব বুঝিলেন,—বলিলেন, "তুমিই প্রশ্ন কর—দ্বিভাষীতে বুঝাইয়া দিবে।"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিয়াছ চন্দ্রশেখর নাম শুনিয়াছ—আমি সেই চন্দ্রশেখর। তুমি তাহার—"

চন্দ্রশেখরের কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে ফষ্টর বলিল—"আপনি কষ্ট পাইবেন না। আমি স্বাধীন—মরণভয় করি না। এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা। আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

নবাব অনুমতি করিলেন, "তবে, শৈবলিনীকে আন।"

শৈবলিনী আনীতা হইল। ফষ্টর প্রথমে শৈবলিনীকে চিনিতে পারিল না—শৈবলিনী রুগ্না, শীর্ণা, মলিনা,—জীর্ণসঙ্কীর্ণবাসপরিহিতা—অরঞ্জিতকুন্তলা—ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি,—মাথায় ধূলি,—চুল আলুথালু—মুখে পাগলের হাসি—চক্ষে পাগলের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক দৃষ্টি! ফষ্টর শিহরিল।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

ফ। চিনি।

ন। এ কে?

ফ। শৈবলিনী,—চন্দ্রশেখরের পত্নী।

ন। তুমি চিনিলে কি প্রকারে?

ফ। আপনার অভিপ্রায়ে যে দণ্ড থাকে—অনুমতি করুন। অমি উত্তর দিব না।

ন। আমার অভিপ্রায়, কুক্কুরদংশনে তোমার মৃত্যু হইবে।

ফষ্টরের মুখ বিশুষ্ক হইল—হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। কিছুক্ষণে ধৈর্য্য প্রাপ্ত হইল—বলিল, "আমার মৃত্যুই যদি আপনার অভিপ্রেত হয়—অন্য প্রকার মৃত্যু আজ্ঞা করুন।"

ন। না। এ দেশে একটি প্রাচীন দণ্ডের কিংবদন্তী আছে। অপরাধীকে কটি পর্য্যন্ত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করে—তাহার পরে তাহাকে দংশনার্থ শিক্ষিত কুক্কুর নিযুক্ত করে। কুক্কুরে দংশন করিলে, ক্ষতমুখে লবণ বৃষ্টি করে। কুক্কুরেরা মাংস-ভোজনে পরিতৃপ্ত হইলে চলিয়া যায়, অর্দ্ধভক্ষিত অপরাধী অর্দ্ধমৃত হইয়া প্রোথিত থাকে। কুক্কুরদিগের ক্ষুধা হইলে তাহারা আবার আসিয়া অবশিষ্ট মাংস খায়। তোমার ও তকি খাঁর প্রতি সেই মৃত্যুর বিধান করিলাম।

বন্ধনযুক্ত তকি খাঁ আর্ত্ত পশুর ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। ফষ্টর জানু পাতিয়া, ভূমে বসিয়া, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধনয়নে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিল—মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি কখনও তোমাকে ডাকি নাই, কখনও তোমাকে ভাবি নাই, চিরকাল পাপই করিয়াছি। তুমি যে আছ, তাহা কখনও মনে পড়ে নাই। কিন্তু আজি আমি নিঃসহায় বলিয়া, তোমাকে ডাকিতেছি—হে নিরুপায়ের উপায়—অগতির গতি! আমায় রক্ষা কর।"

কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বরকে না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে! ফষ্টরও ডাকিল।

নয়ন বিনত করিতে ফষ্টরের দৃষ্টি তাঁবুর বাহিরে পড়িল। সহসা দেখিল, এক

জটাজূটধারী, রক্তবস্ত্রপরিহিত, শ্বেতশ্মশ্রুবিভূষিত, বিভূতিরঞ্জিত পুরুষ দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। ফষ্টর সেই চক্ষুপ্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—ক্রমে তাহার চিত্ত দৃষ্টির বশীভূত হইল। ক্রমে চক্ষু বিনত করিল—যেন দারুণ নিদ্রায় তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন সেই জটাজূটধারী পুরুষের ওষ্ঠাধর বিচলিত হইতেছে—যেন তিনি কি বলিতেছেন। ক্রমে সজলজলদগম্ভীর কণ্ঠধ্বনি যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ফষ্টর শুনিল যেন কেহ বলিতেছে, "আমি তোকে কুকুরের দণ্ড হইতে উদ্ধার করিব। আমার কথার উত্তর দে। তুই কি শৈবলিনীর জার?"

ফষ্টর একবার সেই ধূলিধূসরিতা উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিল—বলিল, "না।"

সকলে শুনিল, "না। আমি শৈবলিনীর জার নহি।" সেই বজ্রগম্ভীর শব্দে পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল। নবাব প্রশ্ন করিলেন, কি চন্দ্রশেখর, কি কে করিল, ফষ্টর তাহা বুঝিতে পারিল না—কেবল শুনিল যে, গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল যে, "তবে শৈবলিনী তোমার নৌকায় ছিল কেন?"

ফষ্টর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি শৈবলিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে হরণ করিয়াছিলাম। আমার নৌকায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, সে আমার প্রতি আসক্ত। কিন্তু দেখিলাম যে, তাহা নহে; সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম সাক্ষাতেই সে ছুরিকা নির্গত করিয়া আমাকে বলিল, 'তুমি যদি আমার কামরায় আসিবে, তবে এই ছুরিতে দুই জনেই মরিব। আমি তোমার মাতৃতুল্য।' আমি তাহার নিকট যাইতে পারি নাই, কখনও তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" সকলে এ কথা শুনিল।

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শৈবলিনীকে তুমি কি প্রকারে ম্লেচ্ছের অন্ন খাওয়াইলে?"

ফষ্টর কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "একদিনও আমার অন্ন বা আমার স্পৃষ্ট অন্ন সে খায় নাই, সে নিজে রাঁধিত।"

প্রশ্ন। কি রাঁধিত?

ফষ্টর। কেবল চাউল—অন্নের সঙ্গে দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই খাইত না।

প্রশ্ন। জল?

ফ। গঙ্গা হইতে আপনি তুলিত।

এমন সময়ে সহসা—শব্দ হইল, "ধুব্রুম্ ধুব্রুম্, ধুম্ ধুম্!"

নবাব বলিলেন, "ও কি ও?"

ইর্‌ফান্‌ কাতরস্বরে, বলিল, "আর কি? ইংরেজের কামান। তাহারা শিবির আক্রমণ করিয়াছে।"

সহসা তাম্বু হইতে লোক ঠেলিয়া বাহির হইতে লাগিল। "দুড়ুম্‌ দুড়ুম দুম্‌" আবার কামান গর্জ্জিতে লাগিল। আবার! বহুতর কামান একত্রে শব্দ করিতে লাগিল—ভীমনাদ লম্ফে লম্ফে নিকটে আসিতে লাগিল—রণবাদ্য বাজিল—চারি দিক্‌ হইতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। অশ্বের পদাঘাত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের জয়ধ্বনি, সমুদ্রতরঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—ধূমরাশিতে গগন প্রচ্ছন্ন হইলে—দিগন্ত ব্যাপ্ত হইল। সুষুপ্তিকালে যেন জলোচ্ছ্বাসে উছলিয়া, ক্ষুব্ধ সাগর আসিয়া বেড়িল।

সহসা নবাবের অমাত্যবর্গ, এবং ভৃত্যগণ, ঠেলাঠেলি করিয়া তাম্বুর বাহিরে গেল—কেহ সমরাভিমুখে—কেহ পলায়নে। কুল্‌সম্‌, চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও ফষ্টর ইহারাও বাহির হইল। তাম্বুমধ্যে একা নবাব ও বন্দী তকি বসিয়া রহিলেন।

সেই সময়ে কামানের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িতে লাগিল। নবাব সেই সময়ে স্বীয় কটিবন্ধ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া, তকির বক্ষে স্বহস্তে বিদ্ধ করিলেন। তকি মরিল। নবাব তাম্বুর বাহিরে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধক্ষেত্রে

শৈবলিনীকে লইয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশেখর দেখিলেন, রমানন্দ স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামী বলিলেন, "চন্দ্রশেখর! অতঃপর কি করিবে?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "এক্ষণে, শৈবলিনীর প্রাণরক্ষা করি কি প্রকারে? চারি দিকে গোলা বৃষ্টি হইতেছে। চারি দিক্‌ ধূমে অন্ধকার—কোথায় যাইব?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "চিন্তা নাই,—দেখিতেছ না, কোন্‌ দিকে যবনসেনাগণ পলায়ন করিতেছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্‌—বলবান্‌—এবং কৌশলময় দেখিতেছি—বোধ হয় ইহারা একদিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করিবে। চল আমরা পলায়ন-পরায়ণ যবনদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই, কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।"

তিন জনে পলায়নোদ্যত যবন-সেনার পশ্চাদ্গামী হইলেন। অকস্মাৎ দেখিলেন,

সম্মুখে এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা—রণমত্ত হইয়া দৃঢ় পর্ব্বতরন্ধ্র-পথে নির্গত হইয়া ইংরেজরণে সম্মুখীন হইতে যাইতেছে। মধ্যে, তাহাদিগের নায়ক, অশ্বারোহণে। সকলেই দেখিয়া চিনিলেন যে, প্রতাপ। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে বিমনা হইয়া বলিলেন, "প্রতাপ! এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।"

"আমি আপনাদিগের সন্ধানেই আসিতেছিলাম। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদিগকে রাখিয়া আসি।" এই বলিয়া প্রতাপ, তিন জনকে নিজ ক্ষুদ্র সেনা-দলের মধ্যস্থানে স্থাপিত করিয়া ফিরিয়া চলিলেন।

তিনি পর্ব্বতমালামধ্যস্থ নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকে, সমরক্ষেত্র-হইতে দূরে লইয়া গেলেন। গমনকালে চন্দ্রশেখরের নিকট দরবারে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিলেন। তৎপরে চন্দ্রশেখর প্রতাপকে বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ধন্য, তুমি যাহা জান, আমিও তাহা জানি।"

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রশেখর বাষ্পগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "এক্ষণে জানিলাম যে, ইনি নিষ্পাপ। যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইঁহাকে গৃহে লইব। কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না।"

প্র। কেন, স্বামীর ঔষধে কোন ফল দর্শে নাই?

চ। এ পর্য্যন্ত নহে।

প্রতাপ বিমর্ষ হইলেন। তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। শৈবলিনী অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে তাহা দেখিতেছিল—শৈবলিনী একটু সরিয়া গিয়া, হস্তেঙ্গিতের দ্বারা প্রতাপকে ডাকিল—প্রতাপ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার নিকটে গেলেন। শৈবলিনী অন্যের অশ্রাব্য স্বরে প্রতাপকে বলিল, "আমার একটা কথা কানে কানে শুনিবে? আমি দূষণীয় কিছুই বলিব না।"

প্রতাপ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম?"

শৈ। এক্ষণে বটে। আজি প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হইয়াছিলাম?

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল। শৈবলিনী, তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "চুপ। এক্ষণে কিছু বলিও না। আমি নিজেই সকল বলিব—কিন্তু তোমার অনুমতিসাপেক্ষ।"

প্র। আমার অনুমতি কেন?

শৈ। স্বামী যদি আমায় পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া, তাঁহার প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত হয়?

প্র। কি করিতে চাও?

শৈ। পূর্ব্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া, ক্ষমা চাহিব।

প্রতাপ চিন্তা করিলেন, বলিলেন, "বলিও! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।" এই বলিয়া প্রতাপ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

শৈ। আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই—

প্র। সে কি শৈবলিনী?

শৈ। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।

প্রতাপ আর উত্তর করিলেন না। দ্রুতপদে অশ্বারোহণ করিয়া, অশ্বে কশাঘাত-পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

গমনকালে চন্দ্রশেখর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাও।"

প্রতাপ বলিলেন, "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর ব্যগ্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "যাইও না। যাইও না। ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "ফষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুতবেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন, "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতি হিংসা করে, যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।"

প্রতাপ বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখনও লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া প্রতাপ পুনরপি অশ্বারোহণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "প্রতাপ, তবে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?"

প্রতাপ মুখ ফিরাইয়া অতি কোমল, অতি মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার

প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া অশ্বে কশাঘাত করিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন। চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তুমি বধূকে লইয়া গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাইব। দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হইবে।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "আমি প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি।" রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "আমি তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেছি।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। সেই ধূমময়, আহতের আর্ত্তচীৎকারে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে, প্রতাপকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কোথাও শবের উপর শব স্তূপীকৃত হইয়াছে—কেহ মৃত, কেহ অর্দ্ধমৃত, কাহারও অঙ্গ ছিন্ন, কাহারও বক্ষ বিদ্ধ, কেহ, "জল! জল!" করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে—কেহ মাতা, ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু প্রভৃতির নাম করিয়া ডাকিতেছে। রমানন্দ স্বামী সেই সকল শবের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত অশ্বারোহী রুধিরাক্ত কলেবরে আহত অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলাইতেছে, অশ্বপদে কত হতভাগ্য আহত যোদ্ধবর্গ দলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের সন্ধান করিলেন, পাইলেন না। দেখিলেন, কত পদাতিক, রিক্তহস্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে রক্তপ্লাবিত হইয়া পলাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। শ্রান্ত হইয়া রমানন্দ স্বামী এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। সেইখান দিয়া একজন সিপাহী পলাইতেছিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সকলেই পলাইতেছ—তবে যুদ্ধ করিল কে?"

সিপাহী বলিল, "কেহ নহে। কেবল এক হিন্দু বড় যুদ্ধ করিয়াছে।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথা?"

সিপাহী বলিল, "গড়ের সম্মুখে দেখুন।" এই বলিয়া সিপাহী পলাইল।

রমানন্দ স্বামী "গড়ের দিকে গেলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ নাই, কয়েকজন ইংরেজ ও হিন্দুর মৃতদেহ একত্র স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। স্বামী তাহার মধ্যে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পতিত হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ গভীর কাতরোক্তি করিল। রমানন্দ স্বামী তাহাকে টানিয়া বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেই প্রতাপ! আহত, মৃতপ্রায়, এখনও জীবিত।

রমানন্দ স্বামী জল আনিয়া তাঁহার মুখে দিলেন। প্রতাপ তাঁহাকে চিনিয়া প্রণামের জন্ম, হস্তোত্তলন করিতে উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

স্বামী বলিলেন, "আমি অমনই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আরোগ্য লাভ কর।"

প্রতাপ কষ্টে বলিলেন, "আরোগ্য? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নাই! আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।"

রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জ্জয় রণে আসিলে? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করিয়াছ?"

প্রতাপ বলিল, "আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন?"

স্বামী বলিলেন, "যখন তুমি শৈবলিনীর সহিত কথা কহিতেছিলে তখন তাহার আকারেঙ্গিত দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। এবং বোধ হয়, তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নাই।"

প্রতাপ বলিলেন, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।"

রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল আসিল। আর কেহ কখনও রমানন্দ স্বামীর চক্ষে জল দেখে নাই। তিনি বলিলেন, "এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী। আমরা ভণ্ড মাত্র। তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবে সন্দেহ নাই।"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "শুন বৎস! আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝিয়াছি। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয়জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?"

সুপ্তসিংহ যেন জাগিয়া উঠিল। সেই শবাকার প্রতাপ, বলিষ্ঠ, চঞ্চল, উন্মত্তবৎ হুহুঙ্কার করিয়া উঠিল—বলিল, "কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে, আমি এই ষোড়শ বৎসর, আমি শৈবলিনীকে কত ভালবাসিয়াছি? পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে,

অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে। কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই—মানুষে তাহা জানিতে পারিত না—এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুলিলেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নাই বলিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন কলুষিত হইয়াছে—কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হইবে? আমার মৃত্যু ভিন্ন ইহার উপায় নাই—এই জন্য মরিলাম। আপনি এই গুপ্ত তত্ত্ব শুনিলেন—আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রদর্শী—আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হইয়া থাকে, এ প্রায়শ্চিত্তে কি তাহার মোচন হইবে না?"

রমানন্দ স্বামী বলিলেন, "তাহা জানি না। মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ; শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাইতেছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারিবে না। তবে, ইহাই বলিতে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন, তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"

রমানন্দ স্বামী নীরব হইলেন। ধীরে ধীরে প্রতাপের প্রাণ বিমুক্ত হইল। তৃণ-শয্যায় অনিন্দ্য জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু পড়িয়া রহিল।

তবে যাও, প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে, রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও। যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মরিতে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পাইলেও, ভালবাসিতে চাহিবে না।

সংক্ষিপ্ত টীকা

উপক্রমণিকা

চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনীকে লইয়া যে মূল কাহিনী রচনা করা হইয়াছে তাহা বাংলাদেশের ইতিহাসের এক যুগসন্ধির অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও বিক্ষোভ দ্বারা আবিষ্ট ও প্রভাবিত। বাংলাদেশের একটি গৃহস্থ ঘরের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়াছে পতনোম্মুখ রাজশক্তির সহিত বিদেশী বণিকসংঘের তীব্র স্বার্থসংঘাত; কাহিনী আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিত্র ঘটনাস্রোত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শৈবলিনীর অন্তর-স্থিত সুপ্ত বাল্যপ্রণয় যখন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল, তখন হইতেই আসল গল্পের আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্ব্বেও আছে সূচনা, লেখক উপক্রমণিকার তিনটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদে এই আখ্যায়িকার সূচনা করিয়াছেন। বীজের মধ্যে যেমন পুষ্পিত বৃক্ষের সম্ভাবনা লুক্কায়িত থাকে, উৎসের মধ্যে যেমন নদীপ্রবাহের রহস্য নিহিত থাকে, তেমনি উপক্রমণিকায় মূল গল্পের তিনটি প্রধান চরিত্রের পূর্ব্ব পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। উপক্রমণিকায় বর্ণিত আখ্যানভাগ মূল কাহিনীর ঘটনার আট বৎসর পূর্ব্বের কথা; মূল গল্প আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনা এমনভাবে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কাহিনী আরম্ভ করিয়া পরে এই পূর্ব্ব পরিচয় দিলে ঘটনার দ্রুত গতি ব্যাহত হইত, ঘটনার ঐক্যসূত্রে ছেদ পড়িত ও রসভঙ্গ হইত।

'চন্দ্রশেখর' যখন বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইতেছিল তখন উপক্রমণিকার এই তিনটি পরিচ্ছেদ একটি পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং "পূর্ব্বকথা" নাম দিয়া উপন্যাসের মাঝামাঝি ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদে বাহির হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, 'পূর্ব্বকথা'কে উপক্রমণিকা নাম দিয়া গ্রন্থের সূচনায় লইয়া আসা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: একটি বালক ও একটি বালিকা; বালকের বয়স পনের ষোল, বালিকার বয়স সাত আট। গঙ্গাতীরে একই গ্রামে তাহাদের বাড়ী, শৈশব হইতেই তাহারা একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে বেড়ায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: প্রণয় বলিতে হয় বল—ষোল বছরের প্রতাপের সহিত আট বছরের শৈবলিনীর এই ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্দ্য প্রণয়ের পর্য্যায়ে পড়ে না সত্য, কিন্তু এই সৌহার্দ্দ্যই গাঢ় হইয়া প্রণয়ে পরিণত হইয়াছিল।

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে—সমস্ত উপন্যাসখানিই অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী। প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয় সমাজের বিধানে সার্থক হইতে পারিবে না, গল্প আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই লেখক তাহার জন্য ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, লেখকের বেদনাবোধ ও সহানুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট।

খেলা ছাড়িয়া কতবার—কত সহজে একটি কবিত্বময় অনুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে!

শৈবলিনী মনে মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত বিবাহ হইবে না—জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিবাহ কি বুঝিবার পূর্ব্ব হইতেই শৈবলিনী জানিয়া রাখিয়াছে, তাহার এই খেলার সাথীই তাহার বর। এই আশা সে মনে পোষণ করিয়াছে, শৈশবের নানা কল্পনা এই আশাকে বেষ্টন করিয়াই কত জাল বুনিয়াছে। প্রতাপের বয়স কিছু বেশী, শৈবলিনীর সহিত বিবাহে যে সামাজিক বাধা আছে তাহা সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত। কিন্তু সে শৈবলিনীকে প্রকৃত কথা বলে নাই, তাহার ভুল ভাঙ্গিয়া দেয় নাই—দিলে ভাল হইত; কিন্তু হয়তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইত না। বয়স হইবার সঙ্গে সঙ্গে শৈবলিনী নিজেই সব কথা জানিবে ও বুঝিতে পারিবে, পূর্ব্ব হইতেই আঘাত দিয়া এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া লাভ কি! যে দীপ্ত পৌরুষ ও অবিচল চারিত্রিক দৃঢ়তা পরবর্ত্তী প্রতাপ-চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা মুগ্ধ কিশোর-চরিত্রে কি করিয়া সম্ভব? প্রতাপও তো শৈবলিনীর মত বহির্মুখ-বিবিক্ষু; প্রণয়ের এ দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার শক্তি ও ইচ্ছা তাহারও ছিল না। গঙ্গার জলে উভয়ে আশাহত জীবনের অবসান করিবার যে সংকল্প করিয়াছিল তাহা উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিয়াই স্থির করিয়াছিল।

শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল—শৈবলিনী হিসাবে পরে আরও ভুল করিয়াছিল—স্বামিগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিলেই সে প্রতাপকে পাইবে, এটি তাহার আর একটি হিসাবে ভুল। অবশ্য প্রথম ভুলটির জন্য সে দায়ী নয়, দায়ী তাহার বয়স ও অজ্ঞতা।

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল—এই জ্ঞান বা বোধ জন্মিবার সঙ্গে সে জানিতে পারিল ও বুঝিতে পারিল প্রতাপের সঙ্গে বিবাহে গুরুতর সামাজিক অন্তরায় আছে। কিন্তু মন যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর

ফিরিবার উপায় নাই। প্রতাপের সঙ্গে বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নাই, অথচ প্রতাপকে ছাড়িয়া সংসারে বাঁচিয়া থাকাও সম্পূর্ণ অর্থহীন। বলা বাহুল্য, প্রতাপও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়াছিল ও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভের সহজ উপায় উভয়ে অনেকদিন ধরিয়া গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল।

প্রতাপ ডুবিল। কিন্তু শৈবলিনী ডুবিল না—শৈবলিনী-চরিত্রে যে পরিমাণ আবেগ আছে, সে পরিমাণ দৃঢ়তা নাই। মৃত্যু সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ তাহার ভয় হইল, পূর্ব্ব সংকল্পের কথা বিস্মৃত হইল, প্রাণরক্ষার জৈব আদিম প্রেরণায় তাহার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিল, তাহারই জন্য যে প্রতাপ ডুবিতেছে সে কথাও উপেক্ষা করিল এই কথা বলিয়া—'প্রতাপ আমার কে!' উভয় চরিত্রের পার্থক্য এই একটি ঘটনায় সূচিত হইয়াছে।

"প্রতাপের প্রেম আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা, শৈবলিনীর প্রেম ভোগেচ্ছার চরিতার্থতা। একের নিষ্কাম, অপরের সকাম। প্রতাপ প্রেমিক, শৈবলিনী ভোগাকাঙ্ক্ষিণী। প্রতাপ চিত্তবলে, শারীরিক দৃঢ়তায় উন্নতশির হিমাদ্রি। শৈবলিনী আকাঙ্ক্ষাপরবশতা হেতু দুর্ব্বলতায় স্রোতোবশগা-নতমুখী বেত্রলতা। প্রতাপ বলী তাই সে চিত্তজয়ী। শৈবলিনা অধীরা ক্ষুদ্র নদী, তাই সে চিত্তবেগরূপ স্রোতের টানে বহমানা।" (বঙ্কিমচিত্র—রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না—ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই, প্রতাপ ডুবিল দেখিয়াও সে প্রাণরক্ষার জন্য স্থলে সন্তরণ করিয়া উঠিয়াছে, এখন কোন্ লজ্জায় আর প্রতাপকে মুখ দেখাইবে। শৈবলিনীর এই ভাবের জন্যই অতি সহজে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেল।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদগ্রস্ত—এই অনুচ্ছেদে অত্যন্ত সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে চন্দ্রশেখরের মনোভাব বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন হয় বলিয়াই তিনি এতদিন বিবাহ করেন নাই, এখনও বিবাহে তাঁহার রুচি নাই, কেবল মাতৃবিয়োগ হওয়াতে সংসার অচল হইয়াছে, দেবসেবা ও রন্ধনাদি সমস্তই নিজে করিতে হয় বলিয়া একজন স্ত্রী প্রয়োজন। স্ত্রী থাকিলে সাংসারিক কতকগুলি সুবিধা হয়—এইজন্যই বিবাহের প্রয়োজন, কিন্তু বিবাহের জন্য তাঁহার অন্তরের কোনও প্রেরণা তিনি অনুভব করেন না। সাধারণ লোকে সংসার বন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্যই বিবাহ করে, কিন্তু চন্দ্রশেখর বিবাহ করিয়াও সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না। চন্দ্রশেখরের পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য

সদ্‌গুণের তুলনা নাই, কিন্তু একজন অসাধারণ পণ্ডিত লোকও যে সাধারণ বিষয়ে কতখানি ভ্রান্ত ধারণা মনে পোষণ করিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই তাহা দেখাইয়াছেন। চন্দ্রশেখর যে বিবাহের অধিকার হারাইয়াছেন—এ কথা তাঁহার মনে হয় নাই।

"দাম্পত্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য যিনি পালন করিতে পারেন না, কেবল গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধন রক্ষার জন্য সুন্দরী পত্নী ঘরে আনেন, তাঁহার দণ্ড ও দশা চন্দ্রশেখরের মতোই হয়।" (কালিদাস রায়)

শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল—নারীর সৌন্দর্য্য কত তপস্বীর তপোভঙ্গের কারণ হইয়াছে; চন্দ্রশেখরের ব্রতভঙ্গ হইবে, 'সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না' এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি! "সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস আসলে প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনের কাহিনী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপন্যাসখানির নাম 'চন্দ্রশেখর' রাখা হইল কেন? চন্দ্রশেখর কি এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র?—না কেন্দ্রস্থ চরিত্র? বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই যখন এই উপন্যাসের 'চন্দ্রশেখর' নাম রাখিয়াছেন তখন উহা বিচার করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত।

সাত আট বৎসরের একটি বালিকা ও কিশোর বয়স্ক একটি বালক—ইহাদের জীবন অবলম্বন করিয়াই লেখক তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। উপন্যাসে ইহাদের পরিণতিই আসল কথা, প্রায়শ্চিত্তের আগুনে শৈবলিনী পুড়িয়া মরিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অক্ষয় স্বর্গগামী হইল। এই পরিণতি দেখাইয়া উপন্যাস শেষ হইয়াছে। এই কাহিনীর মধ্যে চন্দ্রশেখর, দলনী বেগম, মীর কাসেম, গুর্‌গণ খাঁ, লরেন্স ফষ্টর, সুন্দরী ঠাকুরঝি, কুল্‌সম্, গলষ্টন, জনসন, রমানন্দ স্বামী, রূপসী, রামচরণ, আমিয়ট, মহম্মদ তকি খাঁ একে একে সকলেই আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনীর সঙ্গেই ইহাদের সকলের সম্বন্ধ। যেখানে প্রতাপ নাই, শৈবলিনী নাই সেখানে চন্দ্রশেখর নাই, দলনী নাই, ফষ্টর নাই, প্রতাপ ও শৈবলিনী ভিন্ন কাহিনীতে অন্য কাহার'ও স্বাতন্ত্র্য নাই।

আমরা দেখি ভাগীরথী তীরে আম্রকাননে দুই বালক-বালিকা পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সাহচর্য্যে পরস্পরকে ভালবাসিল। এইভাবে শৈশব-প্রণয় জন্মিল। ক্রমে একটু বড় হইয়া তাহারা জানিতে পারিল যে, এই প্রেমে সমাজ তাহাদের বাধা। সমাজের প্রতীক হইয়াই যেন চন্দ্রশেখর আসিয়া বালক-বালিকাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

চন্দ্রশেখর আসিয়াই যেন শর নিক্ষেপ করিলেন। বালক বুক পাতিয়া সে শর সহ্য করিল, কিন্তু বালিকা পারিল না। সমগ্র উপন্যাসখানি তাহারই পাখার ছটফটানি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস সমাজের বিরুদ্ধে শৈবলিনী হৃদয়ের অভিযোগ, আক্রোশ, বিদ্রোহ ও ব্যর্থতার ইতিহাস। আমরা দেখি ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর প্রধান চরিত্র নয়, কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করিলে আমরা লক্ষ্য করিতে পারি উপন্যাসের কাহিনী যেখানে মোড় ঘুরিতেছে সেখানে দাঁড়াইয়া এই ব্রাহ্মণ। বিরহের যে আর্ত্তনাদ এখানে গুমরিয়া উঠিতেছে তাহার প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন চন্দ্রশেখর। প্রতাপ-শৈবলিনীর জীবনের এই অংশ চন্দ্রশেখর ভিন্ন গড়িয়া উঠিতে পারিত না। প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষে চন্দ্রশেখর-চরিত্রই কাহিনীর সমস্ত রূপ দিতেছে। এই দিক দিয়া উপন্যাসের নামকরণ ঠিকই হইয়াছে।

উপন্যাসখানিতে দুই কাহিনী—একটি মুখ্য ও একটি গৌণ—একটি সামাজিক বা ঘরোয়া কাহিনী আর একটি ঐতিহাসিক কাহিনী। এই উভয় কাহিনীর সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া চন্দ্রশেখর। তিনিই দু'টি বিভিন্ন কাহিনীকে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

উপন্যাসের দুইটি গল্প—একটি শৈবলিনী-প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের কাহিনী আর একটি মীর কাসেম-দলনী-গুরগণ খাঁর কাহিনী। ইতিহাসের প্রত্যক্ষ যোগ এই দ্বিতীয় কাহিনীটির সহিত; মীর কাসেম শুধু ঐতিহাসিক চরিত্রই নয়, তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ইতিহাসের একটি প্রকাণ্ড ঘটনা—এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের জন্যই একদিকে জগৎশেঠ, গুরগণ খাঁ ও অন্যদিকে আমিয়ট, জনসন, গলষ্টন প্রভৃতির সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র। তবু মীর কাসেম-দলনীর কাহিনী অপ্রধান গল্প—প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের ঘরোয়া কাহিনীর উপর একটি ক্লাসিক মহিমা বিস্তার করিয়া, দলনী-বেগমের নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট করুণ পরিণাম ও তাহার অশ্রু-সজল কাহিনীকে একটি সুমহান্ পরিবেশ দিয়া ইতিহাস তাহার রথচক্রের দ্রুতগতি থামাইয়া দিয়াছে। উপন্যাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের চেয়ে হৃদয়বিপ্লবের কথাই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে আমরা দুইটি গল্পেরই আরম্ভ দেখিতেছি। দুইটি গল্পের মধ্যে যোগ কোথায়, তাহার সন্ধানও আমরা এইখানে পাইলাম। ইংরেজের সহিত নবাবের যুদ্ধের আশঙ্কা, যুদ্ধবিরতির জন্য দলনীর সপ্রেম অনুনয়, যুদ্ধ যদি নিতান্তই বাধে তবে, যুদ্ধকালে নবাবের সঙ্গিনী হইয়া থাকিবার ইচ্ছা, নবাবের ভবিষ্যৎ গণনা ও বিস্ময়, তৎপরে চন্দ্রশেখরকে বেদগ্রাম হইতে আনাইবার জন্য লোক প্রেরণ—এইভাবে গল্পের আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনার বিষয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখি আট বৎসর শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেছে—চন্দ্রশেখরের সাংসারিক বিষয়ে অমনোযোগ ও ঔদাসীন্য শৈবলিনীকে কিরূপ দুঃসাহসী করিয়া তুলিয়াছে। ভীমা পুষ্করিণীর ঘাটে একটি দৃশ্যের বর্ণনায় ও ঘাট হইতে বিলম্বে প্রত্যাগত শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের কথাবার্ত্তায় ও ঘুমন্ত শৈবলিনীকে দেখিয়া চন্দ্রশেখরের অশ্রুবর্ষণে ও খেদোক্তিতে—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সম্বন্ধের চমৎকার ইঙ্গিতপূর্ণ বর্ণনা পাইলাম। চন্দ্রশেখরের গৃহে শৈবলিনীর আট বৎসর কি করিয়া কাটিল, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নাই, কিন্তু এই একটি পরিচ্ছেদ পড়িলে বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে অসুবিধা হইবার কথা নয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে লরেন্স ফষ্টর কর্ত্তৃক শৈবলিনীর অপহরণ ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সুন্দরীর শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে। শৈবলিনী যে সুন্দরীর সহিত ঘরে ফিরিয়া আসিল না, তাহাতে সুন্দরী যেমন বিস্মিত হইয়াছে, পাঠকও তেমনি বিস্ময় বোধ করিয়াছে। শৈবলিনীর হৃদয়ের রহস্য উপন্যাসকার একটু একটু করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিতেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখি চন্দ্রশেখর নবাবের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বেদগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন—শৈবলিনী বৃত্তান্ত সমস্ত শুনিয়াছেন ও মর্ম্মান্তিক দুঃখে, লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে জীবনের সহচর শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ভস্মীভূত করিয়া একবস্ত্রে ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মুঙ্গের দুর্গের অন্তঃপুরের একটি সুরম্য কক্ষে নবাব মীর কাসেমের সপ্তদশবর্ষীয়া এক বেগম নবাবের প্রতীক্ষা করিতেছে। হাতে তাহার গুলেস্তাঁ—কিন্তু পড়িতে ভাল লাগিতেছিল না। তখন সে বীণা হাতে লইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিল ও মৃদুকণ্ঠে গান ধরিল। এমন সময় নবাব মীর কাসেম প্রবেশ করিলেন। নবাব দলনীকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন, দলনী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। বীণার তারে সুর বাজে না, কণ্ঠও রুদ্ধ হইয়া আসে। তখন কথা আরম্ভ হইল। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা আছে, একথা দলনী শুনিয়াছে। দলনীর আন্তরিক ইচ্ছা নবাব যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন। কারণ দলনীর বিশ্বাস ইংরেজের সহিত যে যুদ্ধ

করিবে সে-ই পরাজিত হইবে। রাজনীতির উপদেশ নবাব কি একটি বালিকার নিকট গ্রহণ করিবেন? দলনী অপ্রতিভ হইল, ক্ষুব্ধ হইল। কিন্তু যুদ্ধ যদি অপরিহার্য হয় তবে দলনী নবাবের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে। এমন সময় দলনী নবাবকে প্রশ্ন করিল যে, দলনী যুদ্ধকালে কোথায় থাকিবে তাহা নবাব গণিয়া বলিয়া দিতে পারেন কিনা। নবাব জ্যোতির্বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। গণনা করিয়া নবাবের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বেদগ্রামের চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে দরবারে আনাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

মুখ ফোটে ফোটে, ফোটে না—প্রণয়ভীরু দলনী আনন্দে ও লজ্জায় যখন নবাবের সম্মুখে কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া কণ্ঠ খুলিয়া গাহিতে পারিতেছে না, তখন প্রকাশের এই অক্ষমতাকে লেখক কয়েকটি বস্তুর সহিত তুলিত করিয়াছেন। মেঘাচ্ছন্ন দিনে কমলিনী, ভীরু কবির প্রথম কবিতা, অভিমানিনী নারীর কণ্ঠাগত প্রণয় সম্বোধনের সহিত দলনীর সলজ্জ সপ্রতিভ ব্যর্থ প্রচেষ্টার তুলনা করা হইয়াছে।

কলিকাতায় ইংরেজেরা যে বাজনা বাজাইয়া ইত্যাদি—সুকৌশলে অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আসল কথার অবতারণা করা হইয়াছে। ইংরেজের সহিত নবাবের বিরোধ ঘনাইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। ইংরেজের সহিত বিরোধের ব্যাপারে দলনী জড়িত হইয়া পড়িবে, দলনীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে এই বিরোধে। দলনী কেবল নবাবের অনুরাগিণী নহে, সে স্বামীগত-প্রাণা। নবাবকে ইংরেজের সহিত বিবাদ না করিবার জন্য দলনী নবাবকে সাধ্যমত অনুরোধ করিল, কিন্তু মীর-কাসেমের স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া তাহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। নবাবকে যখন নিরস্ত করা যাইবে না, তখন সে আসন্ন-বিপদে সর্ব্বদা স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া থাকিবার অনুমতি চাহিল।

আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি—ইহা মীর কাসেমের আত্মশ্লাঘা বা মিথ্যা দম্ভ নয়। ইতিহাসেও আমরা ইংরেজের অন্যায় উৎপীড়নের হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য মীর কাসেমের ব্যাকুলতা দেখিতে পাই।

বরতরফ—বরখাস্ত। বাহাল—নিয়োগ।

আপনার সঙ্গে থাকিব বলিয়া—মুসলমান নরপতিগণ অনেকেই বেগম সঙ্গে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন, বেগমগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যুদ্ধ দেখাইতেন। অনেক সময় একটি গোটা জেনানা মহল সৈন্যগণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে যাইত। কিন্তু দলনী যুদ্ধে নবাবের সঙ্গে থাকিতে চাহিতেছে কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নয়, তাহার অন্তরের প্রেমই বিপদের দিনে স্বামীকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিতে চাহিতেছে।

যাহা দেখিলাম তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর—নবাব ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন দলনীর পরিণাম কেবল অশুভ নয়, অভাবনীয়রূপে বিস্ময়কর। হয় তো শত্রুহস্তে তাহার বন্দিনীভাবে জীবন যাপন ও বিষপানে বন্দিনী জীবনের অবসান গণনায় নবাব জানিয়াছিলেন। সেজন্যই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার জ্যোতিষ শিক্ষাগুরু চন্দ্রশেখরকে দিয়া আবার দলনীর ভাগ্য গণনা করাইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

দলনী নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠুর পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাহার তুলনা চলে না। দলনীর ভাগ্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারই কর্ম্মানুসারে, স্বামীর কল্যাণের জন্য অতিরিক্ত ব্যস্ততায়, নিজের অন্তরের সারল্যের কূট রাজনীতির আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া সে স্বামীকেও বাঁচাইতে পারে নাই, নিজেও ডুবিয়াছে। শেষের দিকে নবাবের বুদ্ধিবিপর্য্যয়ও তাহার পরিণামের জন্য দায়ী।

চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদে আনিতে লোক গেল। নবাবের আমন্ত্রণ পাইয়া দলনী-বেগমের ভাগ্য গণনার জন্য চন্দ্রশেখর বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়া রওনা হইলেন। এই অবসরে তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীকে অপহরণ করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত শৈবলিনীর অপহরণ—উপন্যাসের মধ্যে যাহা প্রধান ঘটনা—তাহার ক্ষেত্র ও সুযোগ প্রস্তুত করা হইল প্রথম পরিচ্ছেদের শেষে।

প্রধান আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই গৌণ বা অপ্রধান আখ্যায়িকারও সূচনা করা হইল। গৌণ ও মুখ্য এই দুইটি কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ আছে বলিয়াই চন্দ্রশেখর উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ চরিত্র, তাঁহারই নামানুসারে উপন্যাসের নাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী ও সুন্দরী গা ধুইতে গিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়াছে—সুন্দরী জল হইতে উঠিবার জন্য তাড়া দিতেছে—সুন্দরী বলিতেছে এদিকে নাকি কয়টা গোরা আসিয়াছে। শৈবলিনী উঠিল না—তালবৃক্ষতলে একটি ইংরেজ দাঁড়াইয়া আছে দেখাইল। সুন্দরী তৎক্ষণাৎ জলের কলস ফেলিয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। শৈবলিনী বক্ষ পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর ধীরে ধীরে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সে আবার আসিয়াছে জানাইল। কিছুক্ষণ কথা বলিয়া ফষ্টর চলিয়া গেলে শৈবলিনী জল হইতে উঠিয়া ঘরে আসিল। শৈবলিনীর ভয় হইয়াছিল বিলম্ব হওয়াতে স্বামী হয়ত ভর্ৎসনা করিতে পারেন। কিন্তু চন্দ্রশেখর গ্রন্থাধ্যয়নে যেন ডুবিয়া আছেন। তিনি কিছুই বলিলেন না। অনেক রাত্রিতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি

শৈবলিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, ঘুমন্ত শৈবলিনীর মুখে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন—শৈবলিনীকে বিবাহ করা তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

(গঙ্গায় ডুবিবার আট বৎসর পরে শৈবলিনীর কথা আরম্ভ হইয়াছে। এই আট বৎসর শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেছে। কিভাবে এই আট বৎসর তাহার কাটিল তাহার কোন বিবরণ লেখক দেন নাই। আমরা কেবল জানি শৈবলিনীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই, আর চন্দ্রশেখর এই আট বৎসর শৈবলিনীর শিক্ষার দিকে কোন মনোযোগ দেন নাই। বিবাহের পূর্ব্বে শৈবলিনী গ্রাম্য অশিক্ষিতা বালিকা ছিল এবং এখনও তাহাই আছে। চন্দ্রশেখরের মত এত বড় পণ্ডিতের ঘরে আসিয়াও তাহার মনের কোনও উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। চন্দ্রশেখরের এদিকে কোন দৃষ্টিই ছিল না। চন্দ্রশেখরের শাস্ত্রচর্চ্চায় ও জ্ঞানানুশীলনে শৈবলিনী কোনও সাহায্য করিতে পারে নাই, স্বামীর স্বেচ্ছাবৃত দরিদ্র জীবনের যে মহিমা তাহা বুঝিবার মত মনের সংস্কার শৈবলিনীর হয় নাই। সংসারে মন বসে যে আকর্ষণে বা যে বন্ধনে শৈবলিনীর তাহা ছিল না। আবার চন্দ্রশেখরের ঔদাসীন্য অমনোযোগ শৈবলিনীর সাহস ক্রমশঃ বাড়াইয়া তুলিয়াছে মাত্র।)

সুন্দরী আর কথা না কহিয়া কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল—সুন্দরীর এই আচরণই স্বাভাবিক "শৈবলিনী হেলিল না—দুলিল না—জল হইতে উঠিল না" এই আচরণ শৈবলিনীরই যোগ্য।

I come again—'again' কথাটিতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। সাহেবের পরিচ্ছদে জাঁকজমক ও চেন, অঙ্গুরীয় প্রভৃতির পারিপাট্য বিশেষ অর্থবোধক।

শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল—গৃহে আসিতে এতটা দেরী হইয়াছে, চন্দ্রশেখর না জানি কত বকিবেন এই ভাবিয়া শৈবলিনী একটু চিন্তিত হইয়াছিল, কিন্তু চন্দ্রশেখর শাস্ত্রাধ্যয়নে ও শাস্ত্রচিন্তায় এতটা তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি যেন অন্য জগতে বিচরণ করিতেছেন, পার্থিব কোনও চিন্তা তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবে এ আশঙ্কা নাই। শৈবলিনীর একটু হিসাবে ভুল হইয়াছিল, অনর্থক সে চিন্তিত হইয়াছিল, এই কথা মনে করিয়া শৈবলিনী হাসিয়া উঠিল।

বটেও ত—এখন এলে নাকি ? বিলম্ব হইল কেন ?—শাস্ত্রচিন্তা ছাড়া অন্য কোনও কথা যে মনে প্রবেশ করিতেছে না, অন্য কোনও দিকে যে চন্দ্রশেখরের দৃষ্টি নাই, তাহা এই কথা কয়টিতে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

আর আসিও না—অন্তমনস্কতার অতি সুন্দর উদাহরণ। গ্রামের ভিতর গোরা ঢুকিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ও তাহারই ভয়ে যাহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী পুকুরে একগলা জলে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তাহার কিন্তু একটুও চিন্তা হইল না। চন্দ্রশেখরের কানে সব কথা ঢুকিলেও মনে কিছুই দাগ কাটিতেছে না। "আর আসিও না" কথাটির কি অর্থ, কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ কথার উত্তরে তিনি একথা উচ্চারণ করিলেন, এই সব ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার কোথায়? এত বড় কাণ্ড ঘটিয়া গেল, অথচ অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে আবার তিনি শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল—চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ভালবাসিতেন। কিন্তু 'শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন?'—এই ভাবিয়া কতকটা অপরাধীর ন্যায় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর কথা ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। তিনি কেবল নিজের সুখের কথাই ভাবিয়াছেন, শৈবলিনীর সুখের কথা ভাবেন নাই —এই কথা মনে হওয়ায় তাঁহার অনুশোচনা হইল। কিন্তু পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য

লক্ষ্য করা যায়, চন্দ্রশেখরের জীবনে একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাঁহার এত সাধ ও সাধনার গ্রন্থরাশি যখন তিনি অগ্নিদগ্ধ করিলেন তখন এই দ্বন্দ্বের পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ লরেন্স ফষ্টর শৈবলিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। শৈবলিনীর সঙ্গে কয়েকবার তাহার দেখাও হইয়াছে। ফষ্টরের ধারণা হইল এই দেশেই যখন বাস করিতে হইবে, তখন এই দেশের একজন সুন্দরীকে সংসারের সহায় বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? বিশেষতঃ, অনেক ইংরেজ এরূপ পূর্ব্বেই যখন করিয়াছে। শৈবলিনীকে লাভ করিবার জন্য ফষ্টর ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব সে, ইচ্ছা যখন হইয়াছে তখন ইচ্ছা পূরণ করিতেই হইবে। ন্যায়-অন্যায়ের কোনও প্রশ্ন তাহার মনে উঠিল না। চন্দ্রশেখর যেদিন নবাবের আমন্ত্রণে বেদগ্রাম ত্যাগ করিলেন, সেই রাত্রেই চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাতি হইল। গ্রামের লোক দেখিল, বাড়ীঘর লুঠ করিয়া মশাল জ্বালাইয়া ডাকাতের দল চলিয়া যাইতেছে; সঙ্গে একখানি পাল্কী, পাল্কীর সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠিয়াল সাহেব। বাধা দেওয়া অসম্ভব মনে করিয়া সকলে নিঃশব্দে সরিয়া আসিল। শৈবলিনী অপহৃত হইল।

(শৈবলিনীর অপহরণ ব্যাপারে শৈবলিনীর প্রকৃতি ও লরেন্স ফষ্টরের দুঃসাহস এই দুইটি জিনিষের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শৈবলিনীর মনের আবেগ ও তাহার প্রকৃতির দুর্দ্দমনীয়তা যত বড়ই হউক না কেন, ফষ্টরের মোহ ও দুঃসাহসের

প্রশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর পক্ষে গৃহত্যাগ অসম্ভব হইত; আবার ফষ্টর যত বড় দুঃসাহসীই হউক না কেন, শৈবলিনীর মন স্থির থাকিলে তাহাকে স্বামিগৃহ হইতে হরণ করিতে পারিত না। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"বিদ্যুৎশিখা যেমন মেঘের আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপে শৈবলিনীর অন্তর্গূঢ় জ্বালাময়ী প্রবৃত্তি ফষ্টরের রূপমোহ ও দুঃসাহসিকতাকে অবলম্বন করিয়া বাহিরে আসিয়াছে ও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনাচক্রের যে পরিণতি তাহাতে উভয়েরই দায়িত্ব আছে; যে অগ্নি জ্বলিয়াছে তাহাতে উভয়েই ইন্ধন জোগাইয়াছে। শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফষ্টরের পাপ-ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না। আবার ফষ্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না।")

শৈবলিনী যাহা তাহা ক্রমে বলিব—লেখক শৈবলিনী-চরিত্রের রহস্য ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এখানে কেবল এই ইঙ্গিতটুকু আছে দুর্ভাগিনী শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের গৃহে আসিয়া নিজেও সুখী হইতে পারিল না, চন্দ্রশেখরের জীবনও দুঃখময় করিয়া তুলিল।

সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল—সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে একটা নির্বীর্য্য কাপুরুষতার ভাব আসিয়াছিল, বিশেষতঃ, ইংরেজ যেখানে উৎপীড়ক সেখানে সে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কোনও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ যে কল্পনাও করা যায় না, পলাশীর পর হইতে বাঙ্গালী ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল। এই গ্লানি বঙ্কিমচন্দ্র অনেকখানি ক্ষালন করিয়াছিলেন প্রতাপ-চরিত্রের নির্ভীকতা ও বীরত্বের বর্ণনায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ভীমা পুষ্করিণীতে যে সুন্দরী দূরে সাহেব দেখিয়া জলভরা কলসী ফেলিয়া দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়াছিল সে নাপিতানীর ছদ্মবেশ ধরিয়া শৈবলিনীর নৌকায় আসিয়াছে শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য। বিরুদ্ধ বায়ুর বেগ বাড়িয়া যাওয়ায় শৈবলিনী যে নৌকায় যাইতেছিল তাহা খুব বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে ছোট ডিঙ্গী নৌকায় তাড়াতাড়ি আসিয়াছে। সকলের চোখে ধূলা দিয়া সুন্দরী নাপিতানী বেশে শৈবলিনীকে আলতা পরাইবার জন্য নৌকার ভিতর প্রবেশ করিল।

শৈবলিনীর সঙ্গে সুন্দরীর যে কথোপকথন হইতেছে তাহা পড়িয়া প্রথম মনে হয় শৈবলিনী বুঝি পরিহাস করিতেছে অথবা সুন্দরীকে পরীক্ষা করিতেছে। ক্রমে

ক্রমে শৈবলিনীর মনের গুপ্তরহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। সুন্দরী শৈবলিনীকে বাঁচাইতে পারিল না, তাহাকে ঘরে ফিরাইতে পারিল না; বকিয়া, রাগিয়া, অভিসম্পাত দিয়া সে ফিরিয়া গেল। শৈবলিনীর উপর তাহার রাগ যতই হউক, সুন্দরী চুপ করিয়া থাকিতে পারে নাই। শৈবলিনীর উদ্ধার সাধনের জন্য সে প্রতাপকে নিয়োজিত করিল।

'গেলে, সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি? ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে—আর কি আমার জাতি আছে?'—কোন কুলবধূ যখন দস্যুদ্বারা অপহৃত হয় তখন উদ্ধার সম্ভাবনার ভাসমান তৃণখণ্ডও সে আঁকড়িয়া ধরে। কিন্তু শৈবলিনীর এ প্রশ্ন সুন্দরী ও পাঠক-পাঠিকা সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। উদ্ধারের এত সহজ পথ আছে, অথচ শৈবলিনী 'অনাসৃষ্টি' এ সমস্ত কি বলিতেছে। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোককে সহজে ফাঁকি দিতে পারে না, নারীর দুর্ব্বলতা নারীর চোখেই সর্ব্বাগ্রে ধরা পড়ে। সুন্দরী এ রহস্য ভেদ করিবার জন্য শৈবলিনীর দিকে মর্ম্মভেদী তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; শৈবলিনীর মনে পাপ আছে, সে এই দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, চোখ নত করিল। কিঞ্চিৎ পরুষভাবে—একটু কঠোর ও রুক্ষ ভাবে।

আমাকে গ্রহণ করিলে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হইবেন না—মনের পাপ ছাড়া শৈবলিনীর আর কোনও অপরাধ নাই, দেহের বিশুদ্ধি, তাহার পূর্ব্বের মতই অক্ষুণ্ণ আছে এই কথাই শৈবলিনী বলিতেছে। তবে আর যাইতে বাধা কি, অনর্থক কালহরণ করিয়াই বা কি লাভ, সুন্দরীর সঙ্গে পাঠক সাধারণেরও এই উদ্বেগ।

কিন্তু যে কলঙ্ক শৈবলিনীকে স্পর্শ করিল তাহা তো কোনও কালেই দূর হইবে না। সমস্ত জীবন এই কলঙ্ক বহন করিতে হইবে, শৈবলিনীর পুত্রকন্যা হইলে তাহারাও এই কলঙ্কের হাত হইতে নিস্তার পাইবে না। শৈবলিনীর এ প্রশ্নের উত্তরে সুন্দরী বুঝাইল—অদৃষ্টে ছিল, মিথ্যা কলঙ্ক দুর্নাম ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু বিবাহিতা নারীর পক্ষে সব অবস্থাতেই স্বামীর ঘরে থাকাই নিরাপদ ও সঙ্গত।

সব ত জান– এইবার আসল জায়গায় আঘাত পড়িয়াছে। স্বামীকে যদি ভালবাসা যায় তবে সকলের সমস্ত অনাদর, অপবাদ সহ্য করিয়াও স্বামীর ঘরে থাকা সম্ভব হয়। কিন্তু যে স্বামীর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ নাই, যাহাকে ভালবাসিতে পারা যাইবে না, তাহার ঘরে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। শৈবলিনী কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতেও রাজী, কিন্তু চন্দ্রশেখরের গৃহে আর কিছুতেই ফিরিবে না।

বঙ্কিমের স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে শৈবলিনী-চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। নিজের দুর্ভাগ্য নীরবে নতশিরে আজীবন বহন করিয়া চলিবার মত প্রকৃতি তাহার ছিল না।

যে জীবন তাহার কাম্য ছিল সে জীবনের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য হইতে যখন সে বঞ্চিত হইল, তখন কোন প্রলোভন তাহাকে ঘরে ফিরাইতে পারিল না। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, সমাজ সকলে মিলিয়া তাহাকে যে আঘাত করিয়াছে, সে-আঘাত সে ফিরাইয়া দিতে চায়, স্পষ্টভাষায় তাহার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহার কথা সে বলিতে চায়। শৈবলিনী পরবর্ত্তী বাঙ্গলা উপন্যাসের মধ্যে নানা নামে বারবার দেখা দিয়াছে।

পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই—যে স্বেচ্ছায় স্বামিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে তাহার মত পাপিষ্ঠা আর কে? সুন্দরীর পরবর্ত্তী কথাগুলিতে শৈবলিনীর প্রকৃতি বেশ ভালভাবে ফুটিয়াছে। নির্লোভ, নিরহঙ্কার শাস্ত্রচর্চ্চারত ব্রাহ্মণের ত্যাগপূত জীবনের যে মহিমা তাহা উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা হৃদয়বত্তা শৈবলিনীর ছিল না। বাল্যপ্রণয়ের অঞ্জন চোখে পড়িয়া সে প্রতাপকে কল্পনানয়নে দেখিতেছে—শৌর্য্যে-বীর্য্যে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে বলিষ্ঠ শক্তিমান্ প্রতাপ আপন প্রভায় সমুজ্জ্বল, শাস্ত্রমগ্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহার কাছে নিষ্প্রভ। প্রতাপের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ও অর্থ-ঐশ্বর্য্যের মূলে যে চন্দ্রশেখর সে কথাও শৈবলিনী কোন দিন চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; নিজগৃহের ভগ্ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিলেন, শৈবলিনীর অপহরণ বৃত্তান্ত শুনিলেন। শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন ; জিনিষপত্র দরিদ্র প্রতিবাসীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তারপর বহুকাল হইতে সংগৃহীত, বহু যত্নের বহু সাধনার গ্রন্থরাশি—দর্শন, স্মৃতি, কাব্য, অলঙ্কার, পুরাণ প্রভৃতি প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থরাশি ভস্মীভূত হইল। চন্দ্রশেখর একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন।

সমস্ত পরিচ্ছেদটি চন্দ্রশেখরের চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করিতেছে। সকল কথা গণনায় স্থির হয় না—দলনীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গণিয়া চন্দ্রশেখর যাহা বুঝিলেন নবাবের নিকট তাহা প্রকাশ করা চলে না—স্ত্রীর সম্পর্কে এতবড় দুঃসংবাদের আভাস স্বামীকে দেওয়া যায় না।

দলনী বেগমের ভবিষ্যৎ গণিয়া, তাহার অদৃষ্টলিপির বিচার করিয়া চন্দ্রশেখর খানিকটা বিষণ্ণমনেই গৃহে ফিরিতেছিলেন। গৃহ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাঁহার মনে একটা অননুভূত উল্লাস ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এ অভিজ্ঞতা চন্দ্রশেখরের নিকট সম্পূর্ণ নূতন! তাঁহার দার্শনিক প্রকৃতি মনের এই পরিবর্ত্তনের

কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। হৃদয়ের গোপনরহস্য চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করিলেন —তিনি কেবল শৈবলিনীকে ভালোবাসেন না, শৈবলিনী সম্পর্কে এক দারুণ মোহ-জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। শৈবলিনীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়া যে চন্দ্রশেখর নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়াছিলেন, নবীনা যুবতীর জীবন অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া যাঁহার মনস্তাপের সীমা ছিল না, অথচ শাস্ত্রচর্চ্চা ত্যাগ করিয়া রমণীমুখপদ্মকে জীবনের সার করিতেও যাঁহার শিক্ষা ও সংস্কার বাধা দিতেছিল সেই চন্দ্রশেখরের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু চন্দ্রশেখর এবার তাঁহার এই মানসিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ভীত সন্ত্রস্ত হইলেন না, সমস্ত ব্যাপারটাকেই মায়া বা অনিত্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টাও করিলেন না। এই নবসঞ্জাত মোহ কাটাইতেও চাহিলেন না, বরং মনে করিলেন সারা জীবন যেন এই মোহজালে আবদ্ধ হইয়াই থাকেন।

আসল কথা শৈবলিনীর সহিত বিবাহের পর হইতেই চন্দ্রশেখরের মনে ধীরে ধীরে শৈবলিনীর প্রতি একটা আকর্ষণ জন্মিতেছিল। ইহার অস্তিত্ব প্রথমতঃ চন্দ্রশেখর স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু এই রূপমোহ (আমরা ইহাকে রূপমোহই বলিব, শৈবলিনীর হৃদয়ের কোনও গুণের পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্র দেন নাই) তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতেছিল। যখন তিনি নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, ক্ষুদ্র একটি স্নেহের অঙ্কুর তাঁহার হৃদয়ভূমিতে দেখা দিয়াছে তখন তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়ন-রত অচপল চিত্ত, তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি ইহাকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিশোধ আছেই। আজ যখন তিনি গৃহে ফিরিতেছেন তখন শৈবলিনীর চিন্তা তাঁহার প্রাণমন আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। এতকাল যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন, নিষ্কাম কর্ম্ম, অনাসক্ত চিত্তে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন, সবই যেন এই নবজাত মোহের নিকট তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর। আর জ্ঞানী হইয়াও তিনি মোহমুক্ত হইতে চাহিলেন না, তিনি আজ প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই মোহই যেন সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাঁহার হৃদয়কে সুধাসিক্ত করিয়া রাখে।

অগ্নি জ্বলিল—অগ্নি যতই জ্বলিতে লাগিল, চন্দ্রশেখরের চরিত্র ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। চন্দ্রশেখর গ্রন্থগুলি দগ্ধ করিলেন কেন? এই গ্রন্থগুলির জন্যই তিনি শৈবলিনীকে পাইয়াও পান নাই। চন্দ্রশেখরের নিকট এই গ্রন্থগুলি কত প্রিয়, কত আপন ছিল তাহা কে না জানে? কত বড় ভুল তিনি করিয়াছিলেন, সংসারের দুইটি প্রিয় জিনিষ তাঁহার ছিল, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি চলিতে পারেন নাই। যাহাকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহা যে হৃদয়ের

এতখানি অধিকার করিয়াছিল তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন নাই। আজ এই সর্ব্বনাশের মুখে দাঁড়াইয়া হৃতসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ তাহার জীবনের সহচর গ্রন্থগুলিকে ভস্মসাৎ করিলেন। চন্দ্রশেখর এইবার শৈবলিনীকে যথার্থভাবে পাইলেন। এখন আর তাঁহার ও শৈবলিনীর মধ্যে কোন বাধা রহিল না। শৈবলিনীকে নূতন করিয়া পরিপূর্ণভাবে চন্দ্রশেখর পাইয়াছেন এই গ্রন্থদাহ ও পরে উন্মাদিনী শৈবলিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বালকের মত রোদনের মধ্য দিয়া। চন্দ্রশেখর যদি শৈবলিনীর অপহরণের পর নির্লিপ্তচিত্তে পুনরায় শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে শৈবলিনী তাঁহার জীবন হইতে চিরকালের জন্য দূরে সরিয়া যাইত। দাম্পত্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণার নামে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর পুনর্মিলন তখন উৎপীড়ন বলিয়া মনে হইত।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডে দলনীর মুঙ্গের দুর্গ ত্যাগ করিয়া গুরুগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন, গুরুগণ খাঁর সহিত দলনীর বিতর্ক ও গুরুগণ খাঁর চক্রান্তে দুর্গদ্বার বন্ধ হইবার ফলে কুলসমের সহিত দলনী বেগমের অসহায়ভাবে গভীর রাত্রিতে রাজপথে ভ্রমণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখরের সহিত দলনী ও কুলসমের সাক্ষাৎ হইল। চন্দ্রশেখর সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দলনী ও কুলসমকে মুঙ্গেরে প্রতাপ রায়ের বাসায় আনিয়া সেই রাত্রির মত অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং দলনীর পত্র নবাবের নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে সুন্দরীর মুখে শৈবলিনীর হরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রতাপ শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য বাহির হইলেন। ফষ্টরের দুইখানি নৌকাই গুরুগণ খাঁ মুঙ্গেরে আটক করিয়াছে। ভৃত্য রামচরণ নদীর ধারের কসাড়বন হইতে প্রথমে নৌকার প্রহরী ও পরে লরেন্স ফষ্টরকে গুলি করিয়া জলে ফেলিয়া দিল, প্রতাপ জলের ভিতর হইতে বজরায় উঠিয়া বজরার দড়ি কাটিয়া বজরাকে গভীর জলে আনিয়া ফেলিল। নৌকার অন্যান্য সিপাহী ও মাঝিকে নিজের পরিচয় দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়া শিক্ষিত হস্তে বজরাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া চলিল।

এক চরে আসিয়া নৌকা লাগিলে রামচরণ বজরায় প্রবেশ করিয়া শৈবলিনীকে বজরা হইতে নামাইয়া, শিবিকায় তুলিয়া, এত রাত্রিতে আর কোথায় যাইবে বুঝিতে

না পারিয়া, প্রতাপের বাসায় শৈবলিনীকে লইয়া আসিল। সেই বাসার অপর কক্ষে দলনী ও কুলসম বাস করিতেছিল। শৈবলিনী জানিল না কাহার বাসায় সে আসিয়াছে এবং প্রতাপের শয়নকক্ষে প্রতাপের শয্যায় সে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রতাপও জানিত না শৈবলিনীকে তাহার শয়নকক্ষেই রামচরণ রাখিয়া আসিয়াছে। প্রতাপ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী—দেখিয়া প্রতাপের চক্ষে পলক পড়িল না। হাতের বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিতে পড়িয়া গেল—শব্দ শুনিয়া শৈবলিনী চোখ চাহিয়া দেখে সম্মুখে প্রতাপ। দৃশ্যটি নাটকীয়। শৈবলিনীকে ভৎর্সনা করিতেই শৈবলিনী প্রতাপকে অনুযোগ করিল, প্রতাপের জন্যই যে সে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে এই কথাও জানাইল। প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিল।

এদিকে জনষ্টন ও গলষ্টন জনকয়েক সিপাহী লইয়া বকাউল্লার সাহায্যে প্রতাপের বাসায় আসিয়া উপস্থিত। দ্বার ভাঙ্গিয়া ইহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রতাপ ও রামচরণকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। দলনীকে ফষ্টর সাহেবের বিবি মনে করিয়া তাহাকেও লইয়া গেল, কুলসমও সঙ্গে চলিল। শৈবলিনী সমস্তই দেখিল।

শৈবলিনী একাকিনী বিনিদ্র অবস্থায় নিজ ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। একটু একটু করিয়া তাহার মনে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহকাল গেল, অনর্থক কলঙ্ক রটিল। একবার আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগিল, আবার মনে হইল প্রতাপকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কি হয় না জানিয়া মরিতেও ইচ্ছা হয় না। চন্দ্রশেখরের কথা মনে হইল, শৈবলিনী চলিয়া আসাতে চন্দ্রশেখরের কি কিছু দুঃখ হইয়াছে? বোধ হয়, হয় নাই কারণ পুঁথিই তাঁহার সব। তবু একবার দেখা হইলে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, দৈহিক বিশুদ্ধি তাঁহার নষ্ট হয় নাই। কিন্তু ফষ্টর মরিয়া গিয়াছে, একথা কে বিশ্বাস করিবে। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি শেষে শৈবলিনী নিদ্রিত হইয়া পড়িল ; বেলা হইলে জাগিয়া দেখে—সম্মুখে চন্দ্রশেখর।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে 'পাপ'—অর্থাৎ শৈবলিনীর পাপের স্বরূপ কি, তাহাই পরবর্ত্তী ঘটনায় ও শৈবলিনীর নিজের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ বাধিবে দলনী এই আশঙ্কায় অত্যন্ত ব্যাকুল। ইংরেজের অস্ত্রবোঝাই নৌকা আটক করাতে এই যুদ্ধ-সম্ভাবনা আরও নিশ্চিত, আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া উঠিতেছে। দলনীর দুর্ভাবনা আরও

বাড়িতেছে। অনেক ভাবিয়া দলনী এক দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। গোপনে গুরগণ খাঁর সহিত সে দেখা করিতে এবং এই উদ্দেশ্যে তাহার নিকট পত্র পাঠাইতে মনস্থ করিল। (গুর্‌গণ খাঁ অবশ্য দলনীর সহোদর ভাই, কিন্তু নবাব বা অন্য কেহ এ কথা জানে না—সুতরাং অন্তঃপুরচারিণী বেগমের পক্ষে গভীর রাত্রিতে দুর্গের বাহিরে সেনাপতির সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।)

কিস্তি—মালবোঝাই বৃহৎ নৌকা।

সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নয়—এইগুলি high politics, military strategy-র কথা। দুর্গের মধ্যে বাহিরের খবর সর্ব্বদাই আসে, এবং তাহা লইয়া সকল শ্রেণীর লোকই আলোচনা করে। পরিচারিকা কুলসম পাঁচজনের মুখে শুনিয়া যাহা শিখিয়াছে তাহাই বলিতেছে। কুলসমের নিজেরও ভয় আছে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিলে ইংরেজই জিতিবে; পলাশীর যুদ্ধের পর দেশের সকলের মনোবল কি পরিমাণ কমিয়া গিয়াছিল, morale কিভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল,—'ইংরেজের হাতে রক্ষা নাই। বুঝি নবাব সিরাজদ্দৌলার কাণ্ড আবার ঘটে'—কুলসমের এই কথাই তাহার প্রমাণ। শৈবলিনীর শিবিকার সঙ্গে ফষ্টরকে দেখিয়া গ্রামবাসীর নিশ্চেষ্টতা একবার দেখিয়াছি, দুর্গের অভ্যন্তরস্থ লোকজনের একটা ত্রস্ত মানসিক ভাবের পরিচয়ও কুলসমের কথায় পাওয়া গেল। কুলসমের এই কথা দলনীকে নবাবের জন্য আরও ব্যাকুল করিয়া তুলিযাছিল, এবং একমাত্র উপায় হিসাবেই সে মরিয়া হইয়া গুর্‌গণ খাঁর সহিত দেখা করিয়া এই আসন্ন অশুভ যুদ্ধ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিল।

কুলসম বিস্ময়ে নীরব হইল—কুলসমের মাত্রাজ্ঞান ছিল। নিজের চাতুরী সম্বন্ধে অনেক বড়াই সে এতক্ষণ করিতেছিল। কিন্তু বেগমের পত্র লইযা গুর্‌গণ খাঁর নিকট পাঠানো কাজটি খুব কঠিন না হইলেও ইহা যে অসঙ্গত ও অন্যায়, ধরা পড়িলে যে অতি গুরুতর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে ইহা কুলসমের অজ্ঞাত ছিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দলনী বেগমের পত্র গুর্‌গণ খাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং ফলও ফলিয়াছে। গুর্‌গণ খাঁ দলনী বেগমের আগমনের প্রতীক্ষায় মধ্য রাত্রিতে বিনিদ্র বসিয়া আছে। ভৃত্যগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—যদি দেখা করিবার জন্য কেহ আসে তবে যেন তাহার পরিচয় চাওয়া না হয় বা বাধা দেওয়া না হয়। দলনীর পত্র পাইয়া গুর্‌গণ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিল—তাহার দুর্দ্ধর্ষ শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ বাধাইতে পারিলে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন অনিশ্চিত থাকে তখন স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির

জন্ত কোনও দুষ্কর্মকেই অকরণীয় মনে করে না যে সব লোক, গুর্‌গণ তাহাদেরই একজন। সুদূর ইস্পাহান হইতে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছে, তাহার ভগিনী নবাবের প্রিয়তমা মহিষী এবং সে নবাবের প্রধান সেনাপতি। কিন্তু দুর্জ্জনের দুরাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, ইংরেজকে যুদ্ধে হারাইতে পারিলেই নবাবকে সরাইয়া যথাসময়ে মসনদ অধিকার করিবে। গজে মাপিয়া যে কাপড় বেচিত, রাষ্ট্রবিপ্লবের সহায়তায় সে দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া বসিবে, ভগিনীর সুখ, সম্মান সে দেখিবার প্রয়োজন বোধ করে না, নবাবের প্রতি কৃতজ্ঞতার কোনও প্রশ্ন তাহার মনে উদয় হয় না। কিন্তু দলনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে বুঝিতে পারিল তাহার উচ্চাভিলাষের পথে কণ্টক আপাততঃ তাহারই ভগিনী দলনী। কথায় কথায় উভয়ের মনোভাবই উভয়ের নিকট ধরা পড়িয়া গেল। দলনী নবাবের অনুরাগিণী, কোনও প্রলোভনেই স্বামীর অনিষ্ট যাহাতে হয় সে পথ সে অনুমোদন করিবে না। গুর্‌গণ খাঁর সমস্ত প্রয়াসকেই সে সকল শক্তি দিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। ভাগ্যের পরিহাসে স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় দুর্গের বাহিরে পা দিয়াই দলনী স্বরচিত জালে জড়াইয়া পড়িল। গুর্‌গণ খাঁ তাহার দুর্গপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। নবাব মহিষী একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া গভীর অন্ধকার রাত্রিতে নির্জ্জন রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

গুর্‌গণ খাঁ একটি ক্ষুদ্র নবাব হইয়া উঠিলেন। মুসলমান কার্য্যাধ্যক্ষেরা সুতরাং বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—সেনাপতির অধীনেই সৈন্যরা থাকিত—বেতন, পুরস্কার সেনাপতির হাত হইতেই সৈন্যগণ গ্রহণ করিত। দেশের যিনি নবাব তাঁহার প্রতি সৈন্যগণের কোনও প্রত্যক্ষ আনুগত্য বা যোগাযোগ ছিল না। সৈন্যগণের উপর নবাবের কোনও হাতও ছিল না। সুতরাং সৈন্যদল যাহার হাতে, শক্তিসামর্থ্যে সেই রাজ্যের শক্তিমান পুরুষ, সকলে ভয়ভক্তি তাহাকেই করিবে। একজন বিদেশী, যাহার আভিজাত্যের কোনও পরিচয় নাই, সে অল্পদিনের মধ্যেই এতখানি শক্তিমান হইয়া উঠিবে ইহা দেশীয় মুসলমান কর্ম্মচারিগণ সহ্য করিবে কেন? কিন্তু গুর্‌গণ খাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস তাহাদের নাই, সেইজন্য কেবল নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই তাহারা সন্তুষ্ট হইল।

এখন কোন্ পথে যাই?—নবাবের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী হইয়া নবাবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেইরূপ কাজ করা, না ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়-অন্যায় এ সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া যাহাতে স্বার্থসিদ্ধি হয় সেইরূপ কাজ করা! বলা বাহুল্য, গুর্‌গণ খাঁর মনে মনুষ্যত্বের লেশমাত্রও ছিল না, সুতরাং কর্ত্তব্য স্থির করিতে গিয়া তাহাকে কোন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

যে যত ডুব দিতে পারিবে, সে তত রত্ন কুড়াইবে—ভারতবর্ষের অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত। এ অবস্থায় যে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে তাহার ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না, উদ্যোগী হইতে হইবে, সাহসী হইতে হইবে।

দেখ, আমি গজে মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার উল্লেখ। খ্যাতিহীন, পরিচয়হীন অবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াই তো দিন কাটিত, উদ্যোগী হইয়া, সাহস করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াই তো ভাগ্য খুলিয়াছে। সুতরাং এখন আর একটু সাহস করিলে সিংহাসনলাভও সম্ভাবনার বাহিরে নয়।

গুর্‌গণ খাঁর মনে যে ভাবে পরপর যুক্তিগুলি আসিতেছে, তাহাতেই তাহার মনের স্বরূপটি স্পষ্টভাবে ধরা পড়িয়াছে। মীর কাসেমের বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার বাধিবে না, দলনীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে তাহার দ্বিধা হইবে না, বিশ্বাসঘাতকের নিকট কোনও সম্পর্ক পবিত্র নয়, কেহ তাহার আপনার নয়।

তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করিতেছ!—দলনীর বয়স অল্প, সংসারের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট নয়, কিন্তু ইহারই সর্ব্বনাশ করিতে গুর্‌গণ খাঁর হৃদয় একটুও কাঁপিল না।

আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন—দলনী দুর্গের ভিতরে থাকিয়া এইমাত্রই জানিয়াছিল যে, ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধাইতে গুর্‌গণ খাঁর উৎসাহই বেশী। কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ কেন যুদ্ধ বাধাইতে চাহেন তাহা দলনী বুঝিতে পারে নাই। রাজনীতিজ্ঞান, লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা, কূটনীতির সহিত পরিচয় থাকিলে দলনী বুঝিতে পারিত যুদ্ধ বাধাইয়া গুর্‌গণ খাঁর কি লাভ! সে কথা জানিলে এবং বুঝিলে দলনী দেখা করিবার জন্য গুর্‌গণ খাঁর নিকট আসিত না।

দলনীর আচরণ স্বামী-অনুরাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কিন্তু ইহাতে বয়সোচিত অনভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছে।

বেদান্ত শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "কুলকন্যা-অনুচিত অসমসাহসিক কার্য্য" বলিয়াছেন। "ভ্রাতার সহিত ভগিনী সাক্ষাৎ করিতে চলিয়াছে—ইহাতে ধর্ম্মের দিক দিয়া দোষের কথা কিছুই নাই, তথাপি দলনীর এই কার্য্য, কি লোকচক্ষুতে, কি সূক্ষ্ম বিচারে, উভয়তই দূষণীয়। প্রথমতঃ, গুর্‌গণ খাঁ যে দলনীর ভ্রাতা, ইহা কেহ এমন কি নবাব পর্য্যন্ত অনবগত। দ্বিতীয়তঃ, নবাবমহিষীর পক্ষে রাত্রিকালে ছদ্মবেশে সেনাধ্যক্ষের শিবিরে গমন—যে গোপন সাক্ষাতের কথা লোকে শুনিলে অভিসারিকার কুৎসিত অভিসার বলিয়া মনে করিবে—তাহা দূষণীয় না বলিয়া আর কি বলিব? এত বড় বুকের পাটা বা এত বড় দুঃসাহস যে, কুলনারীর পক্ষে সম্ভব

—ইহা যদি কেহ বিশ্বাস না করে, তজ্জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া চলে না। স্বতঃশুদ্ধা এবং স্বভাব-সরলার বালিকাবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত বলিয়া অন্যায় কার্য্য ত ন্যায়কার্য্য হইয়া যাইবে না। অগ্নিতে হাত দিলে শিশু বলিয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে অগ্নি কখনও বিরত হয় না।" (বঙ্কিম চিত্র)

আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিতে হইবে—দলনীর আবার হিসাবে ভুল! স্নেহপরায়ণা ভগিনী এখনও বিশ্বাস করে যে, এতটা ব্যাকুলতা দেখিয়া অন্ততঃ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গুরূগণ খাঁ যুদ্ধে বিরত হইবে।

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—দলনী যে যুদ্ধ বাধিবার ভয়ে ব্যাকুল, সে ভয় কি তাহার নিজের প্রাণের ভয়? মীর কাসেমের জন্য, তাহার স্বামীর জন্যই তো তাহার এত দুশ্চিন্তা! মীর কাসেম সিংহাসনচ্যুত হইবেন আর দলনী প্রাণ লইয়া ইস্পাহানে ফিরিয়া যাইবে, একথা তাহার কল্পনারও অতীত। গুরূগণ খাঁর মুখে একথা শুনিয়া তাহার ক্রোধ অতি স্বাভাবিক।

তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাসেম আমার স্বামী?—অনুরাগ ও সতীত্বের দম্ভ এই কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কিঞ্চিৎ বিস্মিত, কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ—দলনী যে ইতিমধ্যেই নবাবের এতটা অনুরাগিণী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভগিনী হইয়াও যে নিজের স্বার্থ ও উন্নতি অভ্যুদয়ের চিন্তা অপেক্ষা স্বামীর মঙ্গলের চিন্তাই বেশী করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে এইজন্য বিস্ময়। দলনীর হৃদয়ের এই দিকটার পরিচয় গুরূগণ খাঁ পায় নাই, জানিতেও চেষ্টা করে নাই; হঠাৎ আঘাত দিতে হইল বলিয়া গুরূগণ খাঁর একটু অপ্রতিভ ভাব। কিন্তু এ ভাব সাময়িক, তারপরই দলনীকে আরও গুরুতর আঘাত দিল—"স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে।" এ কটাক্ষ দলনীর অনুরাগ ও সতীত্বের প্রতি। গুরূগণ খাঁর বিশ্বাস তাহার ভগিনীর এই সাময়িক দুর্ব্বলতা যথাকালে কাটিয়া যাইবে, অনেকেই অনেক কথা বলে, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে মনেরও পরিবর্ত্তন হয়, ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু দলনী আর সহ্য করিতে পারিল না। ভ্রাতার সঙ্গে ভগিনীর চিরকালের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। যে উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছিল তাহা তো সিদ্ধ হইলই না, গুরূগণ খাঁকেও শত্রু করিয়া সে প্রস্থান করিল।—গুরূগণ খাঁও এই আহতা ভুজঙ্গীকে ছাড়িয়া দিল না। তাহার আজ্ঞায় দুর্গপ্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইল।

ছিন্নবল্লীবৎ, ভূতলে বসিয়া পড়িলেন—উত্তেজনা ও ক্রোধের পর চরম অবসাদ ও তাহারই ফলে ক্রমাগত অশ্রুবর্ষণ।

গঙ্গার তরঙ্গমধ্যে আমার স্থান হইবে—ভ্রাতার মনের যে পরিচয় সে পাইয়া আসিয়াছে তাহাতে কিছুতেই আর দলনী গুরুগণ খাঁর নিকট ফিরিয়া যাইতে পারে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অসহায়ভাবে দলনী ও কুলসম রাজপথে দাঁড়াইয়া কি কর্ত্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। দলনীর ইচ্ছা ধৃত হইয়া একেবারে নবাবের নিকট বিচারের জন্য নীত হওয়া এবং নবাবের প্রদত্ত দণ্ড মাথা পাতিয়া লওয়া। এই সময় হঠাৎ ব্রহ্মচারীবেশী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে উভয়ের সাক্ষাৎ। চন্দ্রশেখর দলনী ও কুলসমকে লইয়া নগরের মধ্যে প্রতাপ রায়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। দলনীর পরিচয় জানিয়া ও তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দলনীকে সমস্ত ঘটনা নবাবকে পত্র দ্বারা জানাইতে বলিলেন। নবাবের উত্তর না আসা পর্য্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি মুন্সীর সাহায্যে দলনীর পত্র নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন উত্তর পাওয়া যাইবে জানিয়া আসিয়া দলনীকে নবাবের উত্তর না আসা পর্য্যন্ত ঐ বাসায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

দলনী স্বামীর মঙ্গল কামনায়, আসন্ন যুদ্ধ যাহাতে না বাধে তাহারই চেষ্টায় অন্তঃপুরের বাহিরে গিয়াই অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়িল। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের আশায় যে সাধুপুরুষের সাহায্য দলনী গ্রহণ করিল তিনি তাহাকে এমন স্থানে লইয়া গেলেন যেখানে আর একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটিবে এবং তাহাতে দলনীর সহিত নবাবের মিলন অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, আমি ভয় করিব?—দলনীর নিষ্পাপ মনের পরিচয়। অন্যত্র আমার যাইবার স্থান নাই—স্বামীর নিকট উপস্থিত হওয়া ছাড়া দলনী আর কিছু চায় না। কোনও রূপ ছলনা-কৌশলের আশ্রয় না লইয়া একেবারে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা জানাইয়া সে মনের ভার লাঘব করিতে চায়। স্বামী যদি দণ্ড বিধান করেন তবু নিজের যে কোন অপরাধ নাই একথা স্বামীকে জানাইয়া মরিতেও দলনীর আপত্তি নাই।

আমার মত পথে পথে নিশা জাগরণ করে, এমন হতভাগা কে আছে?—দুর্ভাগ্য উচ্চ-নীচের প্রভেদ করে না, পণ্ডিত-মূর্খ, নারী-পুরুষ ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্রতলে সমভাবেই পিষ্ট হয়।

যে ডুবিয়া মরিতেছে সে অবলম্বনের যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না—

"A drowning man catches at a straw."

ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে?—এই দলনীর ভবিষ্যৎ গণনা চন্দ্রশেখর নিজেই করিয়াছিলেন। সুতরাং কি ঘটিবে তাহার আভাস তিনি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। অন্তঃপুরচারিণী রাজমহিষী নিরাশ্রয় হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়াছেন, দলনীর ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এখন দ্রুতবেগে চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইবে। মানুষের সাধ্য নাই এই গতিরোধ করিতে পারে, কিন্তু মানুষ নিশ্চেষ্ট উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না। চন্দ্রশেখরও মনে মনে স্থির করিলেন তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরী শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখর কাহারও কোনও সংবাদ না পাইয়া অবশেষে প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইল। প্রতাপ সুন্দরীর ভগিনী রূপসীকে বিবাহ করিয়াছেন এবং চন্দ্রশেখরের সহায়তায় নবাব সরকারে উচ্চপদে চাকরী করিতেছেন। প্রতাপ সুন্দরীর মুখে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের সংবাদ পাইয়া বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। পরদিন চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রতাপ মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

কেন, তুমি কি জান না—আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হইতে?—চন্দ্রশেখর, বিশেষতঃ শৈবলিনীর সন্ধান করিতে গেলে বিরোধ বাধিতে পারে, ইংরেজের সঙ্গে এই উপলক্ষ্য লইয়া ঝগড়া বাধিতে পারে, কিন্তু যে চন্দ্রশেখরের কৃপায় তাহার অর্থ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান ও প্রতিপত্তি তাহার উপকারের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জনেও প্রতাপ কুণ্ঠিত নয়। শৈবলিনীর প্রতি পূর্ব্বস্নেহও যে প্রতাপকে এ পথে প্রেরণ করিয়াছিল তাহা সংযমী প্রতাপ মুখে না বলিলেও পাঠকের পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর নয়।

রাগ দেখিয়া সুন্দরীর বড় আহ্লাদ হইল—প্রতাপ যদি কেবল উদাসীনভাবে সমস্ত কথা শুনিয়া যাইত, তাহার মনোভাব যদি কঠোর হইয়া না উঠিত, তবে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা হয়তো প্রতাপ করিত না। এবার সুন্দরী নিশ্চিত বুঝিল যে, প্রতাপ এখন যে কাজে হাত দিতেছে তাহার শেষ না দেখিয়া সে নিবৃত্ত হইবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতার কাউন্সিলে স্থির হইয়াছে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে হইবে। সুতরাং পাটনার কুঠীতে আরও কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। একজন চতুর কর্ম্মচারী মুঙ্গেরে আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া পাটনায় অস্ত্র লইয়া যাইবে ও পাটনার ইলিস সাহেবকে সমস্ত সিদ্ধান্ত জানাইবে। লরেন্স ফষ্টর কলিকাতায় আসিয়া মুঙ্গের হইয়া পাটনায় যাইবে। যে নৌকা শৈবলিনীকে লইয়া মুঙ্গেরের দিকে যাইতেছিল, ফষ্টর কলিকাতা হইতে

আসিবার পথে তাহা ধরিল। তাহার সঙ্গে একখানি অস্ত্রবোঝাই বড় নৌকাও ছিল। কিন্তু মুঙ্গেরে গুর্‌গণ খাঁ ইংরেজের অস্ত্রের নৌকা আটক করিল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে দেখা করিয়াও নৌকা ছাড়িবার অনুমতি পায় নাই। স্থির হইয়াছে যে, নবাব যদি অনুমতি না দেন তবে অস্ত্রের নৌকা মুঙ্গেরে রাখিয়াই ফষ্টর পাটনায় চলিয়া যাইবে।

গভীর রাত্রি। অস্ত্রের নৌকা ও শৈবলিনীর বজরা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। ঘাটের নিকটস্থ কসাড়বন হইতে প্রতাপ জলে নামিয়া আসিল। বজরার প্রহরী ঘুমে ঢুলিতেছে। ঐ অবস্থায়ই সে হাঁক দিল। জলে শব্দ হইল, ফষ্টর নৌকার ভিতর উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া। বন হইতে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, প্রহরীর প্রাণশূন্য দেহ জলে পড়িয়া গেল, প্রতাপ বজরার অতি নিকটে আসিয়া জলে ডুবিয়া থাকিল। ফষ্টর বন্দুক হাতে বজরার ছাদে উঠিল,—কসাড়বনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল, কিন্তু দ্বিতীয় গুলির আঘাতে মস্তকে আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। হাতের বন্দুক বজরার ছাদে পড়িল।

জল হইতে বজরায় উঠিয়া বজরার দড়ি কাটিয়া লগির ঠেলায় প্রতাপ বজরাখানি গভীর জলে ঠেলিয়া দিল। পশ্চাদনুসরণকারীরা ভয়ে পিছাইল, সাহস দেখিয়া ও প্রতাপ রায় নাম শুনিয়া দাঁড়ী-মাঝিরা আর গোলমাল করিল না। কেবল বজরার ছাদ হইতে এক তেলিঙ্গা সিপাই প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিয়াছিল, লগির আঘাতে তাহার হাত হইতে বন্দুক পড়িয়া গেল।

শৈবলিনী উদ্ধারের এই ঘটনাটির গল্প হিসাবে আকর্ষণও যথেষ্ট। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও কোনখানে সামান্য অসঙ্গতি বা ভুল নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শৈবলিনীর বজরা কিছুক্ষণ পরে এক চরায় লাগিল। কয়েকজন লাঠিয়াল ও একটি শিবিকা লইয়া রামচরণ সেখানে উপস্থিত হইল। শৈবলিনীকে শিবিকায় উঠাইয়া রামচরণ বাহকগণের সহিত মুঙ্গেরে প্রতাপের বাসায় উপস্থিত হইল ; দলনী ও কুলসম যে ঘরে ছিল সে ঘরে লইয়া না গিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের ঘরে লইয়া গেল। সেইখানে শৈবলিনীকে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া রামচরণ চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রতাপ বাসায় ফিরিয়া শুনিল শৈবলিনীকে রামচরণ এই বাসায়ই লইয়া আসিয়াছে। প্রতাপের নির্দেশ ছিল অন্যরূপ। সে শিবিকা জগৎশেঠের গৃহে পাঠাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু এত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া দ্বারবানদের সাধাসাধি করিতে রামচরণের মন চাহিল না, বিশেষতঃ সে দুইটি খুন করিয়া আসিয়াছে। প্রতাপ শৈবলিনীকে এই রাত্রেই জগৎশেঠের বাসায় রাখিয়া

আসিতে বলিল। রামচরণ আদেশ পালন করিবার জন্য উপরে যাইয়া দেখে শৈবলিনী ঘুমাইতেছে। এই সংবাদ প্রতাপকে দিলে প্রতাপ একটু আশ্চর্য্য হইল এবং ব্যবস্থা যাহা হয় রাত্রি প্রভাত হইলেই করা হইবে এই ভাবিয়া রামচরণকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া নিজেও বিশ্রাম করিতে গেল।

উপরে উঠিয়া নিজের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বার মুক্ত করিতেই প্রতাপের চোখে পড়িল তাহার শয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। খানিকটা বিহ্বল, খানিকটা অন্যমনস্ক হইয়া প্রতাপ দেখিতে লাগিল। শৈবলিনী ঘুমায় নাই, একটু শব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিল এবং প্রতাপকে দেখিয়া 'কে তুমি' বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রতাপ শৈবলিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। শৈবলিনীকে সুস্থ দেখিয়া প্রতাপ ফিরিতে চাহিল। শৈবলিনী বাধা দিল।

বহুকাল পরে শৈবলিনী-প্রতাপের আবার সাক্ষাৎ। শৈবলিনী মনের সমস্ত কথা ও ব্যথা প্রকাশ করিল। প্রতাপের জন্যই সে গৃহত্যাগিনী এ কথাও স্পষ্ট ভাবেই জানাইল। কিন্তু প্রতাপের সংযম টলিল না—শৈবলিনী প্রত্যাখ্যাত হইল।

শৈবলিনী স্বপ্ন দেখিতেছিল—শৈবলিনীর এই স্বপ্নটি একটি রূপক; ইহার মধ্য দিয়া শৈবলিনীর মনের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাজহংস প্রতাপ, প্রস্ফুটিত পদ্ম শৈবলিনী নিজে; পদ্ম রাজহংসের নিকট যাইতে পারিতেছে না, কারণ মৃণালের বন্ধন তাহাকে একস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। মৃণালের বন্ধন বিবাহিত জীবনের বন্ধন। শূকর এই বন্ধন উন্মূলিত করিয়া দিতে পারে। মৃণালের বন্ধন ছিন্ন হইলে স্বাধীনভাবে পদ্ম রাজহংসের নিকট যাইতে পারে।

এই ভাবিয়া সে পাল্কী বাসায় আনিল—রামচরণের বুদ্ধির পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। তাহারই বন্দুকের গুলিতে সিপাহী ও সাহেব আহত হইয়া জলে পড়িয়াছে—জগৎশেঠের বাড়ীতে এত রাত্রে গেলে তাহার কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া যাইবে, খুনের দায়ে এভাবে ধরা পড়িবার তাহার ইচ্ছা ছিল না। সেইজন্য নিজ বুদ্ধিতে, প্রতাপের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াও পাল্কী বাসায় আনিয়াছিল। অনেক দিনের কথা তাঁহার মনে পড়িল, অকস্মাৎ স্মৃতিসাগর মথিত হইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রহত হইতে লাগিল—পূর্ব্ব-ছত্রেই বলা হইয়াছে প্রতাপ যে নিদ্রিতা শৈবলিনীর দিকে চাহিয়াছিল তাহা অন্যমনস্কতাবশতঃ। এই অন্যমনস্কতার কারণ এইখানে বর্ণিত হইয়াছে। শৈবলিনীকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, এই পূর্ব্বস্মৃতির আলোচনা তাহাকে

এতখানি আবিষ্ট, তন্ময় ও বাস্তব-বিস্মৃত করিয়া তুলিয়াছিল যে, এইভাবে গোপনে দাঁড়াইয়া থাকা যে তার মত সংযমীর পক্ষে শোভন নয়, সে-কথা প্রতাপ ভাবিতেও পারিল না। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল—যে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অধিকার করিয়া আছে, বিবাহিত জীবনে যাহার কথা স্মরণ করিয়া গৃহধর্ম্মে মন বসাইতে পারে নাই, যাহার আশায় কলঙ্কিনী নাম লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এত নিকটে পাইয়া শৈবলিনীর মনে একটা প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস, একটা তীব্র উত্তেজনা হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। শৈবলিনী দুর্ব্বল স্নায়বিক প্রকৃতির নারী নয়, কিন্তু এই অতর্কিত আনন্দ ও বিস্ময়ের আবেগে সেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতাপের যত্নে শৈবলিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে শৈবলিনী কথায় বা আচরণে কোনও অতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করে নাই, শৈবলিনী স্থিরভাবে, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে প্রতাপের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মনে তাহার আগুন জ্বলিতেছিল, উত্তেজনায় নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল, প্রত্যেকটি কথা বলিয়া, একটু নীরব থাকিয়া, পুনরায় শক্তি সংগ্রহ করিয়া আবার কথা আরম্ভ করিতেছিল। প্রতাপের উদাসীনতা, তাহার ক্রোধ ও ঘৃণা শৈবলিনীকে মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিতেছিল, কিন্তু শেষ কথা বলিয়া একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্যই সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ যখন বলিল—"তোমার মরণই ভাল" তখন শৈবলিনীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—সে কাঁদিয়া ফেলিল। অন্যে বলে বলুক, সমস্ত গঞ্জনা অঙ্গের ভূষণ করিয়া শৈবলিনী অবিচল থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতাপ, যার জন্য সে আজ পথের ভিখারী, যার জন্য তাহার সব থাকিতেও কিছু নাই, সে যদি একথা বলে তবে সহ্য করা যায় কি করিয়া!

প্রতাপ তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়াছে, তাহার দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের জন্য তাহার দুর্দ্দম প্রবৃত্তি ও অসংযত হৃদয়ের দোষ দিয়াছে।

শৈবলিনী গর্জ্জিয়া উঠিল—শৈবলিনী মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, কিন্তু প্রতাপের নিকট সে সহানুভূতি পায় নাই, পাইয়াছে কেবল ভর্ৎসনা। প্রতাপ যে তাহাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিতেছে, এ-কথা শৈবলিনী স্পষ্টভাবেই বুঝিয়াছে। এই প্রত্যাখ্যানের অপমান ও বেদনাকে শৈবলিনী সহ্য করিতে পারিল না। দোষ কি কেবল একা তাহারই? প্রতাপের কি কোনও দায়িত্ব নাই? শৈবলিনীর এই উক্তিতে শৈবলিনীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে প্রতাপের যে একটি প্রধান অংশ আছে, সেই কথাই শৈবলিনীর মুখে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই অংশের ভাব ও ভঙ্গী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ব্যর্থতার হাহাকারের সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে একটা অভিমান ও অনুযোগের সুর—খুব স্পষ্ট না হইলেও একটা বিদ্রোহের ভাবও লক্ষ্য করা যায়।

তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে—শৈবলিনী প্রতাপের গুরুপত্নী। সামাজিক এই সম্পর্ক উভয়ের মিলনের বাধা। শৈবলিনী মনে ভাবিয়াছিল সামাজিক সম্পর্ক সমাজ ত্যাগ করিলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। প্রণয়াবেগের প্রাবল্য ও সংযমের অভাব স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া কতখানি ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে শৈবলিনী তাহার দৃষ্টান্ত।

নহিলে ফষ্টর আমার কে?—এই একটি কথায় শৈবলিনীর গৃহত্যাগের সকল রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল—শৈবলিনী বাল্যপ্রণয়কে বুকের মধ্যে এতকাল সযত্নে লালিত করিয়া বর্দ্ধিত করিয়াছে, বিবাহিত জীবন তাঁহার আকাঙ্ক্ষাকে একটুও তৃপ্ত করিতে পারে নাই, একথা উচ্চারণ করিতে শৈবলিনীর একটুও লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা আসিল না, তাহার নিজের দায়িত্ব যে ইহার মধ্যে অনেকখানি আছে (কারণ প্রতাপ এই প্রণয়কে উদ্দীপ্ত করিয়াছে, বয়সে অনেকখানি বড় ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অনেক অধিক থাকা সত্ত্বেও শৈবলিনীকে সে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে নাই) সে কথা শৈবলিনীও বুঝিয়াছে। এতটা প্রতাপ আশা করে নাই। এখন শৈবলিনীর কি হইবে, তাহার কর্ত্তব্য বা কি?

বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া—শৈবলিনীর অভিযোগের কোনও উত্তর নাই এ অভিযোগ সত্য এবং ইহাতে প্রতাপের নিজের দায়িত্বও প্রচুর। এই সমস্ত কথা প্রতাপের মনে একটা জ্বালাময় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। শৈবলিনীর কথার ঝাঁজ কেবল বৃশ্চিক দংশন নয়, প্রতাপের নিজ হৃদয়ে বিবেকেরও একটা দংশন অনুভূত হইতেছিল।

বেগে পলায়ন করিলেন—সংযমী বীরের চরিত্রও অবস্থাবিশেষে কতখানি দুর্ব্বল এই পলায়ন কতকটা আত্মরক্ষার জন্যও বটে। অভিযোগ যখন খণ্ডন করা যায় তখন অভিযোগকারিণীর সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া অপরাধী কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ: শৈবলিনীর বজরার উপরে যে সিপাহীর (বকাউল্লা) হ প্রতাপের লগির আঘাত লাগিয়াছিল সে শৈবলিনীর পাল্কীর পিছনে পিছনে আ

প্রতাপের বাসা দেখিয়া গেল ও খবর দেওয়ার জন্য আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল। বজরায় যে কাণ্ড ঘটিয়াছে আমিয়ট সাহেব সব শুনিয়াছেন। দোষীকে যে ধরাইয়া দিতে পারিবে তাহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। বকাউল্লা দুইজন ইংরেজ ও কয়েকজন সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসায় উপস্থিত হইল। জনসন ও গলষ্টন পদাঘাতে বাড়ীর কবাট ভাঙ্গিয়া দলবল লইয়া ভিতরে ঢুকিল। প্রতাপ ও রামচরণ ধৃত হইল, ফষ্টর সাহেবের বিবি মনে করিয়া দলনীকেও সাহেবেরা লইয়া গেল। কুলসম দলনীর সঙ্গে গেল। শৈবলিনী একা বাড়ীতে রহিয়া গেল।

নগর-প্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া, ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল—পলাশীর যুদ্ধের পর সর্ব্বস্তরের অধিবাসীর মধ্যেই ইংরেজের প্রতি একটা সসম্ভ্রম ভীতির ভাব দেখা দিয়াছিল।

ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা—রামচরণের এই জ্ঞান যদি দেশের বড় লোকদের থাকিত!

“ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজী লাথিতে টিকিবে না”, “এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক” এই সংক্ষিপ্ত কথাগুলি সেকালের ইংরেজ চরিত্রের অপরিমিত দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : প্রতাপের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া শৈবলিনী আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিল। যে আশায় সে এতকাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিল সে আশা ফুরাইয়াছে। প্রতাপের আশায় সে আত্মহত্যা করিতে পারে নাই। সে আশা যখন শেষ হইয়া গেল তখন মরিতে আর বাধা কি? কিন্তু প্রতাপকে যে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার কি হয় না হয় না জানিয়া মরিতেও যে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু এই প্রতাপই তো তাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। বড় আঘাত পাইয়া তাহার মন ছুটিয়া চলিল বেদগ্রামে তাহার আপনার গৃহে। হায়, এই গৃহে ফিরিবার পথও সে নিজে হাতে বন্ধ করিয়া আসিয়াছে। কি মিথ্যা আশা মনে লইয়া সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। তাহার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা এমনিভাবেই মিথ্যা হইয়া গেল। লাভ হইল শুধু কলঙ্ক। কাঁদিতে কাঁদিতে আবার ছুরি বাহির করিল, নিজের বুকে ছুরি বসাইতে গিয়া মনে হইল, মরিতে হয় বেদগ্রাম গিয়া সুন্দরীকে সকল কথা বলিয়া মরিতে হইবে। চন্দ্রশেখরের কথা মনে পড়িল। স্বামীর কাছে কি কোনও কথা বলিবার নাই? আছে, কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করিবে?

কেন গৃহত্যাগ করিলাম, ম্লেচ্ছের সঙ্গে আসিলাম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরিলাম

না?—শৈবলিনী হৃদয়ে কৃতকর্ম্মজনিত প্রথম প্রতিক্রিয়া। আশা ভঙ্গে তাহার মনে হইল যাহা করা হইয়াছে তাহা উচিত হয় নাই।

কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ—নিজের বুদ্ধির দোষে ইহকাল পরকাল সমস্ত নষ্ট করিয়া শৈবলিনী অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল—আশ্রয়হীনার পক্ষে পূর্ব্ব আশ্রয়ের কথা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কলঙ্ক মাথায় লইয়া এই যে ঘৃণিত স্তরে সে নামিয়া আসিযাছে সেখান হইতে তাহার পরিত্যক্ত স্বামিগৃহ বড়ই সুন্দর বলিয়া মনে হইল। গৃহের বাহির হইয়াছে প্রতাপের জন্য, ভাবিয়াছিল গৃহের বাহির হইলেই প্রতাপকে পাওয়া যাইবে। এ পাপ চিত্রের অবতারণা করিতাম না—পরিণাম যদি মঙ্গলজনক হয় তবেই পাপের বিবরণ দেওয়ার সার্থকতা আছে—ইহা শিল্পী বঙ্কিমের অভিমত।

মরি, ত সেই বেদগ্রামে গিযা মরিব—ধীরে ধীরে বিবাহিত জীবনের মর্য্যাদার কথা তাহার মনে দেখা দিতেছে। চন্দ্রশেখরের দিকে কোনও দিন সে চাহিয়া দেখে নাই, কিন্তু আজ প্রতাপের সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট মূর্ত্তির আড়ালে চন্দ্রশেখরের প্রশান্ত মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে।

তাঁহাকে কি বলিযা মরিব,—সেই সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি ব্যথায় ম্লান হইয়া গিয়াছে, কলঙ্কের গ্লানি পবিত্র কুলকে স্পর্শ করিয়াছে, স্বেচ্ছায় সে স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাঁহাকে বলিবার আর কি কথা থাকিতে পারে!

আমি তাঁহার কেহ নহি, পুঁথিই তাঁহার সব—অভিমান। চন্দ্রশেখর যদি শৈবলিনীর দিকে দৃষ্টি দিতেন, যদি অধ্যয়নরত দার্শনিক শৈবলিনীকে কেবল গৃহকর্ম্মের সহায় না ভাবিয়া মানস-সঙ্গিনী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেন তবে শৈবলিনী বাল্যপ্রণয়কে এইভাবে মনে মনে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিবার শক্তি পাইত না।

একবার নিতান্ত সাধ হয়,……কি করিতেছেন—প্রথমে অতি প্রবল সহানুভূতি পরে অভিমান ও শেষে চন্দ্রশেখরের প্রতি স্নেহের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে শৈবলিনীর জটিল চরিত্র আরও জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রতাপকে পাওয়া যাইবে না, তাহার চক্ষে সে পাপিষ্ঠা। প্রতাপের আশা ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া থাকারও কোন অর্থ নাই। প্রতাপের প্রত্যাখ্যান ও ভৎর্সনা শৈবলিনীর হৃদয়ের খানিকটা পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। প্রত্যাখ্যানের বেদনার মধ্য হইতে জন্ম নিয়াছে অনুশোচনা। অনুতপ্ত হৃদয়ের অলক্ষিত এক কোণে দেখা দিতেছে চন্দ্রশেখরের প্রতি সদ্যোজাত অনুরাগের অঙ্কুর।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ডের প্রধান বক্তব্য বিষয় শৈবলিনী কর্তৃক বন্দী প্রতাপের উদ্ধার ও প্রতাপের জীবনরক্ষার জন্য শৈবলিনীর পলায়ন। এই খণ্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে 'পুণ্যের স্পর্শ'। প্রতাপের সান্নিধ্যে আসিয়া, তাহার স্পর্শ লাভ করিয়া শৈবলিনীর জীবনে পরিবর্ত্তন আসিল—আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন—এ প্রশ্ন শৈবলিনীকে এখন ব্যাকুল করিয়া তুলিল। শৈবলিনী প্রতাপের নিকট হইতে পলায়ন করিল, দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব যেমন ভীত হইয়া পলায়ন করে, শৈবলিনী সেইরূপ প্রতাপের নিকট হইতে ছুটিয়া পলাইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ : চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে উপদেশ দিতেছেন। পরদুঃখ মোচনের চেষ্টাতেই নিজের দুঃখ দূর হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। চন্দ্রশেখর পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণত হইলেন। শৈবলিনীর অপহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া জীবনে বীতস্পৃহ ও অবসাদগ্রস্ত শিষ্যকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য ও চন্দ্রশেখরের সম্মুখে একটা উচ্চ জীবনাদর্শ তুলিয়া ধরিবার জন্য রমানন্দ স্বামী শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

যেই পরোপকারী, সেই সুখী—যথার্থ সুখ বা যথার্থ পুণ্য আত্মোদর পোষণে নাই। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে—তাহাতে বলা হইয়াছে সহস্র কোটি শাস্ত্রগ্রন্থে যে কথা বলা হইয়াছে তাহা একটি শ্লোকার্দ্ধে বলা হইতেছে—পরের উপকারেই যথার্থ সুখ—পরের উপকারেই যথার্থ পুণ্য—ইহার আর অন্য পথ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দলনীর পত্র পাইয়া নবাব দলনীকে আনিবার জন্য প্রতাপের বাসায় শিবিকা পাঠাইলেন। দলনীকে পূর্ব্বরাত্রে ইংরেজেরা লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনীকেই দলনী মনে করিয়া নবাবের নিকট আনয়ন করা হইল। শৈবলিনী নবাবকে সমস্ত কথা বলিল, দলনীকে দুইজন ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহারাই প্রতাপ ও তাহার ভৃত্যকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী তারপর নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী রূপসী বলিয়া পরিচিত করিল এবং নবাবকে অনুরোধ করিল তাহাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে। নবাব গুর্‌গণ খাঁর সহিত দেখা করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিল—যুক্তি দিয়া বুদ্ধি দিয়া যতখানি বুঝিতে পারা যায় শৈবলিনী বুঝিয়াছিল প্রতাপকে সে লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু হৃদয় এই কথা মানিতে চায় না। ইংরেজের হাত হইতে প্রতাপকে উদ্ধার করিবার একটা কল্পনা শৈবলিনীর মনে ইতিমধ্যেই আসিয়াছে। সে অনায়াসে নিজেকে প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। বাস্তবে যাহা হইবার আশা নাই অথচ যাহার জন্য সে উন্মুখ—একটা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও সে প্রতাপের পত্নী-রূপে অন্ততঃ একদিনের জন্য নিজেকে দাঁড় করাইয়া একটা তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। প্রতাপের প্রতি অনুরাগের প্রাবল্য, প্রতাপের প্রতি একটা দুর্দ্দম আকর্ষণই ইহাতে প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গুরগণ খাঁর সহিত কথা কহিয়া নবাব জানিতে পারিলেন আমিয়ট প্রতাপ রায়কে ধরিয়া কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছে। গুরগণ খাঁ যে ইহারই মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাও নবাব বুঝিলেন, কিন্তু আসন্ন যুদ্ধে গুরগণ খাঁ যে প্রকাণ্ড সহায় এই কথা চিন্তা করিয়া মুখে কিছুই বলিলেন না। নবাব মীর মুন্সীকে আদেশ দিলেন মুর্শিদাবাদে তকি খাঁ যেন আমিয়টের নৌকা আটক করে ও বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া দেয়। শৈবলিনীকে ডাকিয়া নবাব এই কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু শৈবলিনী নিজেই প্রতাপকে উদ্ধার করিবে, কিছু সাহায্য পাইলে সে নিজেই প্রতাপের হাতে অস্ত্র দিয়া আসিবে। শৈবলিনীর এই আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নবাব অগত্যা একজন দাসী, রক্ষক, কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও একখানা দ্রুতগামী ছিপ শৈবলিনীকে দিতে বলিলেন। শৈবলিনী প্রতাপের উদ্ধারে যাত্রা করিল।

দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে—ইহা অবশ্য ভাল কথা, কিন্তু কোনও উচ্চতর নীতিরক্ষার জন্য গুরগণ খাঁ একথা বলিতেছে না। আসলে আমিয়টের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে গুরগণ খাঁর ষড়যন্ত্র ছিল, গুরগণ আমিয়টকে হাতে রাখিতে চাহিতেছিল।

বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—গুরগণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার দু'মুখো ভাব ধরা পড়িয়া গিয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইলে ইহার বোঝাপড়া হইবে।

নবাব হাসিলেন—দরবারী কায়দায় পিছু হাঁটিয়া সেলাম করায় শৈবলিনীর অভ্যাস ছিল না, তাহার অপটুতা নবাবের পক্ষে কৌতুককর হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার বালুকাময় চরে একখানি বড় বজরা বাঁধা আছে। বজরার ভিতরে কয়েকজন সাহেব আমোদ করিতেছে। হঠাৎ

নারীকণ্ঠে ক্রন্দন উঠিল। সাহেবেরা চমকিয়া উঠিল। আমিয়ট খেলা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একটি স্ত্রীলোক কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু বুঝা গেল না। স্ত্রীলোকটিকে সঙ্গে করিয়া আমিয়ট নৌকার দিকে আসিল। এই স্ত্রীলোকটি আর কেহ নহে, শৈবলিনী।

এই অধ্যায় ও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শৈবলিনী কর্ত্তৃক প্রতাপের উদ্ধার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। যে কৌশলে শৈবলিনী প্রতাপের উদ্ধার করিল তাহা সম্ভব কিনা, বিশ্বাসযোগ্য কিনা, এ সম্বন্ধে সকলে অবশ্য একমত নহেন। ইহার গল্পাংশের আকর্ষণ এত প্রবল, ইহার বর্ণনাভঙ্গী এত চমৎকার, পরিবেশ সৃষ্টি এত নিখুঁত, পড়িতে কোনও জায়গায় আটকায় না। আধুনিক যুগের কোনও 'রিয়ালিস্‌টিক' সামাজিক উপন্যাসে অবশ্য ইহা মানাইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ বহু পরিশ্রম করিয়াও সাহেবেরা বুঝিতে পারিল না, স্ত্রীলোকটি কেন কাঁদে বা সে কি চায়। তাহার কথাও কেহ বুঝিতে পারে না, সেও তাহাদের কথা বুঝে না। শৈবলিনীকে খানসামাদের নিকট আনা হইল। বুঝা গেল মেয়েটি পাগল ও কিছু খাইবার জন্য কাঁদিতেছে। কিন্তু শৈবলিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে, খানসামার ছোঁয়া খাইবে না। খানসামা তখন শৈবলিনীকে লইয়া ব্রাহ্মণ কয়েদী প্রতাপ রায়ের নিকট গেল, তাহার হাঁড়িতে যদি ভাত থাকে। প্রতাপের হাঁড়িতে অবশ্য ভাত ছিল না, কিন্তু সে বলিল হাতকড়ি খুলিয়া দিলে সে ভাত বাড়িয়া দিবে। প্রতাপের হাতকড়ি খোলা হইল। মিছামিছি সে ভাত বাড়িতে লাগিল। প্রতাপের অভিপ্রায় এই সুযোগে পলায়ন। শৈবলিনী নৌকায় প্রবেশ করিয়া ঘোমটা খুলিয়া দিল এবং প্রতাপের কানে কানে তৎক্ষণাৎ পলাইতে বলিল। তাহার জন্যই বাঁকের মোড়ে ছিপ প্রস্তুত আছে। শৈবলিনী পাগলামীর ভান করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, সে মুসলমানের ভাত খাইয়াছে। তাহার জাতি গিয়াছে, সে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিবে। প্রতাপ স্ত্রীলোকটিকে বাঁচাইবার অছিলা করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। শৈবলিনী আগে আগে সাঁতরাইয়া যাইতেছে, পিছনে পিছনে প্রতাপ। লরেন্স ফষ্টর এক নৌকায় বসিয়া শৈবলিনীকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রতাপ বলিল, সে স্ত্রীলোকটিকে ধরিতেছে। সকলে নিরস্ত হইল। শৈবলিনী-প্রতাপ গঙ্গার স্রোত ভাঙ্গিয়া সাঁতরাইয়া চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ প্রতাপ-শৈবলিনী গঙ্গার তরঙ্গ ঠেলিয়া সাঁতার দিয়া চলিতে লাগিল। প্রতাপ ডাকিল 'শৈবলিনী—শৈ!' শৈবলিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—কতকাল পরে আবার সেই সম্বোধন। গঙ্গার জলের ছলছল শব্দ, উপরে আকাশ

ভরিয়া চাঁদের আলো, কতকাল পরে অগাধ জলে এই সুখের সাঁতার। দু'জনেরই প্রাণ-মন উছলিয়া উঠিল, হৃদয় গলিয়া গেল, কিন্তু প্রতাপের সংযম ভাঙ্গিল না। প্রতাপ বলিল—আমার হাত ছুঁইয়া শপথ কর, আমাকে ভুলিবে, আমার চিন্তা ভুলিবে, নতুবা বল, এই চাঁদের আলোয়, এই গঙ্গার জলে জীবনের বোঝা নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই। শৈবলিনী শিহরিয়া উঠিল, চিন্তা করিল—এইবার তাহার মনে প্রশ্ন জাগিল আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন? শৈবলিনী শপথ করিল—আজ হইতে সকল সুখে তাহার জলাঞ্জলি, সে মনকে দমন করিবে, প্রতাপের চিন্তা ভুলিবে, আজ শৈবলিনী মরিল।

[চিত্র হিসাবে এই অংশটি অনবদ্য! বঙ্কিমের রোমান্টিক কবিপ্রকৃতি এই অংশে যে চিত্ররস ও কাব্যরস পরিবেশন করিয়াছে তাহা তুলনাবিহীন। গল্পের দিক হইতেও এই অংশটির সার্থকতা সুস্পষ্ট। অপহৃতা শৈবলিনীকে ইহার পূর্ব্বে উদ্ধার করিয়াছিল প্রতাপ, শৈবলিনীর প্রেম প্রত্যাখান করা তখন বিজয়ী প্রতাপের নিকট অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু চাকা ঘুরিল, অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। এবার প্রতাপ বন্দী, শৈবলিনী যে সাহস ও বুদ্ধিবলে প্রতাপের উদ্ধারসাধন করিল তাহা প্রতাপকেও বিস্মিত করিয়াছে। শৈবলিনী নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, প্রতাপের প্রতি কতখানি প্রবল আকর্ষণ ও ভালবাসা থাকিলে ইহা সম্ভব, তাহা বুঝিতে প্রতাপের বিলম্ব হইল না। কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় তাহার মনের বিরূপ ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। হৃদয় গলিয়া গিয়াছে। যে উদ্ধার করিল, যে জীবন বাঁচাইল, তাহার প্রতি রোষ, অবহেলা বা ঘৃণা অসম্ভব। তারপর চারিদিকের এই অনুকূল আবেশময় পরিবেশ। চাঁদের আলোয় সমস্ত গঙ্গার জল হাসিয়া উঠিয়াছে, তাহারই মধ্য দিয়া দুইজনে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, দুইজনেরই প্রাণে অপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হইল। কতকাল পরে প্রতাপ আবার ডাকিল, 'শৈ', শৈবলিনী আনন্দের আবেশে চক্ষু মুদিল—এ কি জাগরণ না স্বপ্ন, বাস্তব না কল্পনা! এই অবস্থায়ও প্রতাপের সংযম ভাঙ্গিল না, প্রতাপ নিজে বাঁচিল, শৈবলিনীকেও রক্ষা করিল। এই অবস্থায় প্রতাপ-শৈবলিনী কাহারও মনের সংযম থাকিবার কথা নয়, কিন্তু প্রতাপ এই যুদ্ধেও জয়লাভ করিল। প্রতাপ-চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করিবার জন্যই এই দৃশ্যের অবতারণা। এই চিত্তজয়ের শক্তি প্রতাপ পাইয়াছে কোথা হইতে? তাহার এই চরিত্রের দৃঢ়তা, অপূর্ব্ব সংযম, ইহার মূলে রূপসীর কোন প্রভাব আছে কি? বঙ্কিমচন্দ্র রূপসীর কথা বিশেষ কিছুই বলেন নাই। রূপসী সম্বন্ধে পাঠকেরও কোন আগ্রহ জাগে না। কিন্তু এই অংশটি

পড়িতে পড়িতে মনে হয় অন্তত: এই দৃশ্যটিতে রূপসী অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতাপের মনোবল বাড়াইয়াছে।]

সমস্ত উপাখ্যানটি প্রতাপ-চরিত্রের উজ্জ্বলতা বাড়াইয়াছে। এই মহৎ চরিত্রের পুণ্য প্রভাব শৈবলিনীর মনের পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

সেই ঊর্দ্ধস্থ অনন্ত নীলসাগরে দৃষ্টি পড়িল !—চন্দ্রকরোদ্ভাসিত গঙ্গাবক্ষে সন্তরণ করিতে করিতে প্রতাপ ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দ্বারা তাহার মনে উচ্চ ভাব-দার্শনিক চিন্তার উদয় হইতেছে এই কথা সূচিত হয়। সুখে-দুঃখে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সংসারে বাস করা আর গঙ্গার তরঙ্গ ঠেলিয়া সাঁতার দেওয়া প্রতাপের নিকট উভয়ই মূলত: একই জিনিষ।

এ জলের ত তল আছে—আশা নাই, জীবনে কোনও আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। শৈবলিনীর অদৃষ্টরহস্যেরও কোনও শেষ নাই, শৈবলিনী এই কথা ভাবিতেছিল। জড় প্রকৃতির দৌরাত্ম্য !—প্রকৃতি মানুষের মনের অবস্থা দেখে না, তাহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য সর্ব্বদা সমভাবে উৎসারিত হইতেছে।

এ সকল কেবল প্রতাপের চক্ষে। শৈবলিনীর চক্ষে নহে—হাস্যময়ী প্রকৃতি, গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গ, জলে চাঁদের আলোর খেলা প্রতাপের পৌরুষ ও কঠোরতার মধ্য হইতে কিশোর, প্রেমিক, মুগ্ধ প্রতাপকে ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু শৈবলিনী সাঁতার দিবার সময় নৌকায় যে ফষ্টরের রুগ্ন শীর্ণ মুখ দেখিয়াছিল তাহার কথা ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রতাপের মুখে 'শৈ' ডাক না শুনা পর্য্যন্ত তাহার মনে একটা প্রবল অশান্তির ঝড় বহিতেছিল। প্রতাপের কণ্ঠে তাহার নাম শুনিবামাত্র তাহার মন সমস্ত ভুলিয়া আবার পূর্ব্বের মধুর ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

আজিও এ মরা গঙ্গায় চাঁদের আলো কেন ?—স্বপ্নময় সুখাবেশময় সেই পুরাতন স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া কি লাভ ? প্রত্যাখ্যানের বেদনার আঘাতে মন তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সুখের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে; পূর্ব্বস্মৃতি আলোচনা করিয়া, অতীতের উজান বহিয়া পূর্ব্বের জীবনে ফিরিয়া যাওয়া কি যায় না ?

চাঁদের না সূর্য্যের—প্রতাপের নিকট যে সত্য উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা সন্দেহের রাত্রির অবসান ঘটাইবে না, শৈবলিনীর নবজীবনেও সুপ্রভাত আনিয়া দিবে।

তুমি যদি আবার সেই নাম ধরিয়া আজ না ডাকিতে, তবে আজ তার শোধ দিতাম -শৈবলিনী ডুবিতে পারে নাই, প্রতাপ ডুবিয়াছিল একথা শৈবলিনী মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। প্রতাপের নিকট প্রত্যাখ্যান লাভ করিয়া এই কলঙ্কিনী

গৃহত্যাগিনীর আর বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু প্রতাপের কণ্ঠে তাহার নাম সেই পূর্ব্বের মধুমাখা স্বরে উচ্চারিত হইয়াছে, জীবনের স্বাদ বহুকাল পরে আবার সে পাইয়াছে, আর কি শৈবলিনী মরিতে পারে ?

তাহার চক্ষে, তারা সব নিবিয়া গেল—এই সুখ, এই স্বর্গ এত ক্ষণস্থায়ী ? তাহার চক্ষুর সম্মুখে এত আলোর বন্যা অকস্মাৎ নিভিয়া গেল, তাহার নিরাশ জীবনের অন্ধকারের মধ্যে যে হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমক দেখা দিয়াছিল, তাহা এক নিমেষেই মিলাইয়া গেল। প্রতাপ না জানি কি কঠিন শপথের কথা বলিবে।

কাছে আইস—হাত দাও—শৈবলিনীর গঙ্গা নাই, ধর্ম্ম নাই, কিন্তু প্রতাপ আছে ; সেই প্রতাপের হাতে হাত দিয়াই সে শপথ করিবে।

উভয়ের মধ্যে কেহ জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভি-নিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন—শৈবলিনী যখন পলায়ন করিল তখন সে কোথায় গেল কি করিল এই সমস্ত কথা জানাইবার জন্য এইখানে রমানন্দ স্বামীর উপস্থিতি।

শৈবলিনী শপথ করিতে পারিল না—স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নিজের হৃৎপিণ্ড কেহ ছেদন করিতে পারে না, প্রতাপকে ভুলিবার শপথ শৈবলিনীও তাই প্রথমে করিতে পারিল না।

কিছু না, আইস তবে দুইজনে ডুবি—প্রতাপ শৈবলিনীর দুঃখ বুঝিয়াছে, কিশোর বয়সে আর একবার দুইজনে গঙ্গায় ডুবিতে গিয়াছিল, এবারও সেই সঙ্কল্প ; কিন্তু এবার শৈবলিনী প্রতাপকে ডুবিতে দিবে না, তাহার জীবন-নদীতে এবার বিপরীত তরঙ্গ দেখা দিল।

গম্ভীর, স্পষ্টশ্রুত, অথচ বাষ্পবিকৃত স্বরে—প্রতাপকে বাঁচাইতে হইবে, তাহার অসার প্রাণের জন্য প্রতাপ জীবন বিসর্জ্জন দিবে তাহা শৈবলিনী এখন কল্পনা করিতে পারে না। যতই কষ্ট হউক, প্রতাপকে ভুলিতে হইবে। কথা বলিতে বলিতে বুকের মধ্য হইতে ক্রন্দন কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছে অথচ অসীম মানসিক বলে তাহাকে দমন করিয়া নিজের মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও নিষ্ঠুর কথা সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতেছে। এই শক্তি, এই সামর্থ্য, শৈবলিনীর ছিল, শৈবলিনীর চরিত্রের আলোচনায় এই কথাটি লক্ষ্য করিবার জিনিষ। তাহার দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগ তাহাকে যেমন নীচে নামাইয়াছিল, তাহাকে দিয়া অসাধ্যসাধন করাইয়াছিল, তেমনি এই প্রচণ্ড আবেগ যখন আঘাত পাইয়া অন্যদিকে ফিরিল তখনও সে অসাধ্য সাধন করিবে।

নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তাহার মন প্রস্তুত ছিল কিনা এ প্রশ্ন অধিকাংশ পাঠকই করিয়া থাকেন, এই কয়েক ছত্র পড়িলে তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যে রাত্রে প্রতাপ পলাইল সেই রাত্রে রামচরণও কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ পশ্চাদনুসরণত ইংরেজের অনুচরদিগকে পিছনে ফেলিয়া ছিপখানি একটি নিভৃত স্থানে লাগিলে সকলের অলক্ষিতে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া, প্রতাপকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। শৈবলিনী নিজেকে দুর্ব্বল ভাবিয়াই, পলায়ন করিল। প্রতাপের নিকটে থাকিলে সুখ, আকাঙ্ক্ষা এ সব তো মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলা যাইবে না, তাই প্রলোভনের বিষয় ত্যাগ করিয়াই সে চলিল। প্রতাপ জানিতে পারিলেই তাহার অনুসন্ধান করিবে এইজন্য কোনখানে না থামিয়া সে যতদূর পারিল চলিল। সম্মুখে পর্ব্বত, সমস্ত দিন অনাহারে বনে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে অন্ধকারে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। শৈবলিনীর কষ্ট হইল না, স্বেচ্ছায় সে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছে!

ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অন্ধকার আরও গভীর হইল। শৈবলিনী পাষাণখণ্ডে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ শৈবলিনী অনুভব করিল কেহ যেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়াছে। শৈবলিনীকে কেহ দুইহাত দিয়া তুলিয়া লইয়া পর্ব্বতে উঠিয়াছে।

মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে; কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা—শৈবলিনীর মনে ভয় জন্মিয়াছে, এ ভয় সংস্কারমূলক। যে পাপ সে করিয়াছে তাহার জন্য দেবতা তাহাকে শাস্তি দিবেন, এই শাস্তির ভয় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে। তাহার জীবনে আর মায়া নাই, বাঁচিয়া থাকিবার আর লোভ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার কি করিতে পারে?

এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে—কে কি উদ্দেশ্যে এই নির্জ্জন পর্ব্বত গাত্রে অন্ধকার রজনীতে তাহাকে দুইহাতে তুলিয়া লইয়া কোথায় যাইতেছে তাহা শৈবলিনী বুঝিল না। এক রূপোন্মত্ত ফষ্টর ছাড়া শৈবলিনী আর কাহাকেও ভয় করিত না। এ যখন ফষ্টর নয় তখন গুরুতর ভয়ের কারণ নাই। অনাহারে-অনিদ্রায়, পর্ব্বত আরোহণের শ্রমে ও ঝড়ে-জলে ভিজিয়া শৈবলিনীর দেহ ও মন ক্লান্ত; সুতরাং প্রতিরোধ করিবার শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ খণ্ড

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের চতুর্থ খণ্ড হইতেই গল্পের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। গল্পের একটি পর্ব্ব যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, এইখান হইতে যেন নূতন পর্ব্ব আরম্ভ হইল। আমরা যে শৈবলিনীকে চিনিতাম সে শৈবলিনী মরিয়াছে। চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আগামী যুদ্ধের জন্য প্রতাপের প্রস্তুতির বিবরণ দিয়া উপন্যাসকার অপর তিনটি পরিচ্ছেদে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা করিয়াছেন। শৈবলিনীর এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারটাকেই আধুনিক সমালোচকগণ ঠিক বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না, অথচ এই তিনটি অধ্যায়ে বঙ্কিমের কবি-কল্পনা এতখানি ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে যে, ইহাকে উপেক্ষাও করা চলে না।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর উদ্দাম প্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। এই অতৃপ্ত প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সে লরেন্স ফষ্টরের সহায়তায় গৃহত্যাগ করিয়াছে ; তাহার এই গৃহত্যাগের পর তাহার জীবনে কত বাধা, বিপদ আসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত অবস্থাতেই প্রতাপের প্রতি এই প্রেমকে সে হোমশিখার মত আপনার হৃদয়ে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে!

কিন্তু প্রতাপ তাহার এই প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করিল। চন্দ্রশেখরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃই হউক বা তাহার স্বভাবসুলভ নীতিবোধের জন্যই হউক, সে শৈবলিনীকে গ্রহণ করিতে চাহিল না। গঙ্গাবক্ষে শৈবলিনীকে দিয়া শপথ করাইয়া লইল। শৈবলিনীর সব আশা এক মুহূর্ত্তে শেষ হইয়া গেল।

এই দুরাশাতাড়িতা নারীর ব্যর্থতা একটি করুণ ট্র্যাজেডির বিষয় সন্দেহ নাই এবং চরম আশাভঙ্গের মুহূর্ত্তে এই ট্র্যাজেডির যবনিকাপাত সাহিত্যকলার দিক দিয়া যে সুন্দরই হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পর শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তরূপ নূতন ঘটনার সৃষ্টি করিয়া উপন্যাসের আর একটি পর্য্যায়ের অবতারণা করিলেন, বিশুদ্ধ সাহিত্য বিচারের দিক হইতে আলোচনা করিলে এই নূতন পর্য্যায় রচনায় কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। প্রতাপ-শৈবলিনীর গঙ্গাবক্ষে সন্তরণই নিঃসন্দেহে উপন্যাসের climax—এবং ইহার পরই উপন্যাসের শেষ। প্রত্যাখ্যানের পর শৈবলিনী কি করিল, কোথায় গেল তাহার সমস্ত সংবাদ সরবরাহ করিয়া পাঠকের গল্পের কৌতূহলকে তৃপ্ত করিতে

গল্প-লেখক বাধ্য নহেন, বরং অনেক সময় ঐরূপ করিলে উপন্যাসের শিল্পগত মর্য্যাদা হ্রাস পায়। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও অনুতাপের বর্ণনায় বঙ্কিমের কবি-কল্পনা বহু উচ্চে আরোহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শৈবলিনীর দৈহিক নিষ্পাপত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য শেষের দিকে প্লটের মধ্যে অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, ইহার ফলে গল্পের গতিতে একটা মন্থরতা আসিয়া গিয়াছে। সবচেয়ে বড় কথা শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়াছে বঙ্কিমের নীতিবোধ, তাঁহার শিল্পবোধ বা সাহিত্য-বোধ নয়।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্য-বোধ দ্বারাই পরিচালিত হইতেন না। তাঁহার সামাজিক নীতিবোধ দেশাত্মবোধের মতই তাঁহার উপন্যাস রচনার প্রেরণা দান করিয়াছিল। প্রতাপের প্রত্যাখ্যানে আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি সাহিত্যকলার দিক দিয়া হয়তো শোভনতর হইত, কিন্তু বঙ্কিমের সূক্ষ্ম নীতিবোধ তাহাতে অতৃপ্ত থাকিয়া যাইত। যে পাপের বীজ শৈবলিনী নিজে রোপণ করিয়াছিল, তাহা কিরূপে মহীরুহ হইয়া শৈবলিনীর জীবনকে ছায়ান্ধকার করিয়া তুলিল ও কিভাবে তাহা সমূলে উৎপাটিত হইল তাহা দেখানো বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। সাহিত্যে শিব আদর্শকে তিনি অস্বীকার তো করেন নাই এবং এই আদর্শের পৃষ্ঠপোষকতা করা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি করণীয় মনে করিয়াছিলেন।

নীতিবোধের সহিত আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের বিরোধ কোথায়? শিব আদর্শে পরিকল্পিত ও গঠিত সাহিত্য যে উচ্চশ্রেণীর কাব্যরসকে পোষণ করিতে পারে না এমন নয়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের নীতিবোধ চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সাহিত্যিক মূল্য খর্ব্ব করিয়াছে কিনা তাহাই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয় নিছক নীতিবোধই বঙ্কিমচন্দ্রকে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় সৃষ্টির প্রেরণা দেয় নাই। তাঁহার সাহিত্যবোধই তাঁহাকে নবতর অধ্যায় সংযোজনা করিয়া প্রতাপ-শৈবলিনীর ব্যর্থ প্রণয় কাহিনীকে সার্থকতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত নীতির নির্য্যাতন নয়, প্রচণ্ড অন্তর্দ্দাহের মধ্য দিয়া শৈবলিনীকে নূতনতর লোকে উত্তীর্ণ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল, তবে দান্তে বা মিলটনের কাব্যপাঠ হয়তো তাঁহাকে এই জীবন্ত নরক বর্ণনা করিতে উৎসাহিত করিয়াছে! নূতনতর লোকে উত্তরণই শৈবলিনী-চরিত্রের সার্থকতা। ইহার নীতিগত প্রয়োজন ইহার সাহিত্যগত সিদ্ধিকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তবে এই রহস্যময় প্রায়শ্চিত্তের অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র

যে ঔপন্যাসিকের বাস্তবমুখী বিচার-বুদ্ধিসঙ্গত বিশ্লেষণের দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছেন এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ: চন্দ্রশেখরের কৃপায় প্রতাপ এখন পদস্থ ব্যক্তি। সে জমিদার, আবার দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে বা দুর্দ্দান্তকে দমন করিতে তাহার দস্যুতা করিতেও বাধে না। প্রতাপ শৈবলিনীকে ছিপে না দেখিতে পাইয়া চিন্তিত হইল। শৈবলিনী আর ফিরিল না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিল সে ডুবিয়া মরিয়াছে। প্রতাপ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। শৈবলিনীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? সে নিজে অবশ্য নয়, কারণ তাহার কি দোষ? চন্দ্রশেখর অবশ্য খানিকটা দায়ী, রূপসী এমন কি সুন্দরীকেও কিছু দায়ী বলিয়া মনে হইল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী দায়ী লরেন্স ফষ্টর. সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে শৈবলিনীর জীবন এমন করিয়া নষ্ট হইত না। সুতরাং ফষ্টর এবং ফষ্টর যাহাদের প্রতিনিধি সেই ইংরেজ জাতির উপর প্রতাপের রাগ হইল। ফষ্টরকে আবার মারিতে হইবে, এই অসুরদিগকে বাঙ্গলা হইতে তাড়াইতে হইবে। সুতরাং প্রতাপের এখন কর্ত্তব্য হইবে ইংরেজ উচ্ছেদে নবাবের সহায়তা করা।

এখন তাহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে—শৈবলিনী এতকাল দুরাশাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ রাখিয়াছিল, এখন তাহার সে আশা ফুরাইয়াছে। জীবনে যাহার কোন আকর্ষণ নাই, আশা নাই তাহার মরা অসম্ভব নয়।

সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ, এবং খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়—ইহা military strategy বা সামরিক নীতির কথা। প্রতাপের মুখে এই কথা এই অবস্থায় সুন্দর মানাইয়াছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে এখানে ও অন্যত্র সমর-নীতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিস্তৃতি প্রমাণিত হইতেছে!

গুরগণ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন—নবাবের পক্ষে ও ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতাপ রায় একটা বিপুল শক্তি সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, গুরগণ খাঁর মনস্কামনা সহজে সিদ্ধ হইবে না ভাবিয়া এই বিশ্বাসঘাতক চিন্তিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শৈবলিনী কল্পনায় জীবন্ত নরক ভোগ করিতেছে। দুই দিনের অনাহার, পথের ক্লেশ, ঝড়-বৃষ্টি, শরীর দুর্ব্বল, মন অবসন্ন। জাগরণও নয়, নিদ্রাও নয়, কিন্তু চৈতন্য বিলুপ্ত হইতেছে। শৈবলিনী নরকের বিভীষিকা দেখিতেছে —এই মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তির উপায় কি? দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত। কিন্তু এ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া শৈবলিনী কত দিন আর বাঁচিবে? চন্দ্রশেখরের সহিত কি দেখা

হয় না? সাতদিন ফল-মূল আহার করিয়া যদি দিন-রাত স্বামীর চিন্তা শৈবলিনী করিতে পারে তবে সাক্ষাৎ হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শৈবলিনী অনন্যমনা হইয়া স্বামী চিন্তা করিতে লাগিল। সাধনার ফল ফলিল। দুর্ব্বল দেহ-মন লইয়া আবার বিভীষিকা দেখিল, তাহার পর চেতনার সঞ্চার হইলে দেখিতে পাইল সম্মুখে চন্দ্রশেখর।

যে এ ব্রতের পরামর্শ দিয়াছিল সে মনুষ্যচিত্তের সর্ব্বাংশদর্শী—বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি-সমূহকে মনঃসংযোগ দ্বারা কোন একটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করা যায়, ধ্যান, জপ প্রভৃতি দ্বারা বিষয়ান্তর হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া এক লক্ষ্যে অভিমুখীন করা যায়।

বিকৃতিপ্রাপ্তি হইয়া উঠিল—একাগ্রতা বা তন্ময়তার আধিক্য শৈবলিনীকে খানিকটা অস্বাভাবিক করিয়া তুলিল, তাহার উন্মাদ লক্ষণ প্রকাশ পাইল।

শৈবলিনীর চিত্তে চির-প্রবাহিত নদী ফিরিল—এতদিন পর্য্যন্ত শৈবলিনীর মনে চন্দ্রশেখরের কোন স্থান ছিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ছিল প্রতাপ। কিন্তু এই সাধনার বলে অবাধ্য মন সংযত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর দেখা হইল। শৈবলিনীর বিকার ভাব তখনও চলিতেছে। শৈবলিনী মৃত্যুভয়ে, নরকের ভয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিহরিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রশেখর জানিতে পারিলেন ফষ্টর বলপূর্ব্বক শৈবলিনীকে অপহরণ করে নাই। শৈবলিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছিল। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর দুর্ব্বলতা ও কাতরতা দেখিয়া, তাহার উন্মাদ লক্ষণ ক্রমশই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে দেখিয়া তাহাকে গুহার গহ্বরে আনিলেন। চন্দ্রশেখরের যত্নে ও সেবায় শৈবলিনী খানিকটা সুস্থ হইল, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতি তাহার পরিপূর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সঙ্গে কাঁদিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণবদনে চন্দ্রশেখর চলিলেন; উন্মাদিনী সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

এই পরিচ্ছেদে দেখি শৈবলিনীর মুখ হইতে চন্দ্রশেখর প্রথম জানিতে পারিলেন শৈবলিনী স্বেচ্ছায়ই ফষ্টরের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল।

এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের ধারণা ছিল গৃহত্যাগ ব্যাপারে শৈবলিনীর দোষ নাই, দায়িত্ব নাই, সবলের উৎপীড়নে, অত্যাচারে তাহার এ দুর্দ্দশা। চন্দ্রশেখর যখন গ্রন্থরাশি ভস্ম করিয়াছিলেন তখন জানিতেন শৈবলিনী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! কিন্তু এখন শৈবলিনী যে স্বামিত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছায়ই চলিয়া গিয়াছিল একথা তো তাহার নিজের মুখেই শুনিলেন। চন্দ্রশেখর খুবই আঘাত পাইলেন।

প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইলে আবার দেখা হইবে বলিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। কিন্তু শৈবলিনীর আকুলতা তাঁহাকে বাধা দিল। "রক্ষা কর, রক্ষা কর, তুমি আমার স্বামী। তুমি না রাখিলে কে রাখে?"

চন্দ্রশেখরের যাওয়া হইল না, চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে বেদগ্রামে লইয়া যাইবেন ও সুন্দরীকে শৈবলিনীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিবেন।

এই দৃশ্যে চন্দ্রশেখরের প্রেমের পরীক্ষা ও মনুষ্যত্বের পরীক্ষা! দাম্পত্য ধর্ম্মে একজন যদি পতিত হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই কি সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের মত আদর্শ চরিত্র পুরুষের মধ্য দিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি, স্খলন-পতন স্বামী যদি ক্ষমা না করিতে পারে তবে কে করিবে? আদর্শ পত্নী যেমন স্বামীর দোষ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে, আদর্শ স্বামীও তেমনি বিপথগামিনী স্ত্রীর সকল দুর্ব্বলতা ক্ষমা করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে। চন্দ্রশেখর এই অনুতপ্তা, উন্মাদিনী, কণ্ঠলগ্না, রোদনপরায়ণা শৈবলিনীকে ক্ষমা করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চমখণ্ডের সমগ্রই আমিয়ট, ফষ্টর, দলনী ও কুলসম ও গুরগণ খাঁর কাহিনী। প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাই নবাবের আদেশ অনুসারে তকি খাঁ মুর্শিদাবাদে ইংরেজের নৌকাগুলি নজরবন্দী রাখিয়াছে। আমিয়ট সাহেবকে তকি খাঁ নিমন্ত্রণও করিয়াছে, ইংরেজগণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল না। উভয়ের অভিসন্ধি উভয়ে বুঝিল; মুসলমানগণ বর্শা ও তরবারি লইয়া ইংরেজগণকে আক্রমণ করিল, ইংরেজেরাও বন্দুকের গুলিতে শত্রু নিপাত করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমিয়ট, জন্‌সন্, গল্‌ষ্টন আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ফষ্টর, দলনী ও কুলসমকে লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় পিছনে একখানা নৌকা আসিতে দেখিয়া ফষ্টরের মনে হইল নবাবের নৌকা বুঝি তাহাকে অনুসরণ করিতেছে, দলনীর জন্যই নিশ্চয় নৌকাখানি পিছু ছাড়িতেছে না। ফষ্টরের ভয় হইল, দলনীকে নামাইয়া দিলেই বোধ হয় গোল চুকিয়া যায়। দলনীও ব্যাকুলতা-বশতঃ জ্ঞান হারাইল। ফষ্টরকে অনুরোধ করিয়া সে তীরে নৌকা লাগাইয়া

নামিয়া পড়িল, কুলসম নবাবের শাস্তির ভয়ে নামিল না। ফষ্টরের নৌকা চলিয়া গেল, পিছনের নৌকাখানিও চলিয়া গেল, দলনী গঙ্গার নির্জ্জন তীরে পরিত্যক্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি গভীর, দলনী অপরিচিত নদীতীরে একা। কিছুক্ষণ পরে এক বিরাটকায় পুরুষ আসিয়া দলনীর পাশে বসিল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নৃত্যগীত উপলক্ষ্য করিয়া মীর কাসেমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য জগৎশেঠের প্রাসাদে গুরূগণ খাঁ মিলিত হইয়াছে। প্রতাপ রায় নবাবকে সাহায্য করিবার জন্য কেন সদলবলে প্রস্তুত হইতেছে তাহার কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা অনুমান করিতে পারিতেছে না। চতুর্থ পরিচ্ছেদে দলনী সম্পর্কে তকি খাঁর মিথ্যা সংবাদ দানের বিষয় অবগত হইল। দলনী মুঙ্গেরে যাইতে চায়। স্বামীর নিকট গেলে অমঙ্গল হইবে একথা শুনিয়াও দলনী স্বামীর নিকট যাইতে ইচ্ছুক।

সমস্ত পঞ্চম খণ্ডটির মধ্যে শৈবলিনী প্রসঙ্গ একেবারেই বর্জ্জিত হইয়াছে। গৌণ কাহিনীটি—ইতিহাসের সঙ্গে যাহার যোগ প্রত্যক্ষ, চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। যে সমস্ত ঘটনার সূত্র ধরিয়া দলনী ও মীর কাসেমের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে, সেই সূত্রগুলিকে আকর্ষণ করিয়া লেখক ঘটনার বিস্তৃত জালকে আবর্ত্তের কাছাকাছি টানিয়া আনিতেছেন।

ইংরেজদের নৌকাগুলি মুর্শিদাবাদ পৌঁছিলে মহম্মদ তকি খাঁ আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। তকি খাঁ গোপনে পাহারা বসাইলেন, নৌকাগুলি যেন না পালায়। আমিয়ট স্থির করিলেন নিমন্ত্রণে যাইবেন না। যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিতেছে তাহাদের আবার নিমন্ত্রণ রক্ষা কি!

দলনী বেগম ও কুলসম আলাপ করিতেছিল—দলনী মুক্তিলাভ করিয়া নবাবের নিকট যাইতে চাহিতেছে আর কুলসম ভাবিতেছে যতদিন ইংরেজের নৌকায় থাকা যায়—নবাবের হাতে পড়িলেই তো শাস্তি।

এদিকে আমিয়ট, জন্‌সন্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে লাগিল। দলনী বেগম ও কুলসমকে পাড়িত ফষ্টরের নৌকায় তুলিয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। প্রহরীগণ তৎক্ষণাৎ তকি খাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। তকি খাঁ আমিয়টকে নৌকা ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া আসিতে আদেশ দিল। আমিয়ট সে আদেশ মানিল না। গুলীবর্ষণ আরম্ভ হইল। মুসলমান সৈন্যগণ নৌকাগুলি আক্রমণ করিল। আমিয়ট প্রমুখ তিনজন ইংরেজ বহু সৈন্যের সম্মুখে তরবারি হস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইল।

আমিয়ট অগত্যা স্বীকার করিলেন—নবাবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলে

যুদ্ধ তখনি বাধিত ; সুতরাং মুখে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন, যাওয়া না যাওয়া পরের কথা।

বুঝি মুক্তি নিকট—ইংরেজদিগকে নিমন্ত্রণ করার মধ্যে যে একটা অভিসন্ধি আছে তাহা দলনীর নিকটও গোপন ছিল না।

মরিতে হয় তাঁহারই চরণে পতিত হইয়া মরিব—বহুবল্লভ নৃপতির বহু প্রণয়িনীর মধ্যে একজন হইয়াও দলনীর এই উক্তি যথার্থ অনুরাগের চিহ্ন।

যেদিন একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে ইত্যাদি—স্বদেশ হইতে বহুদূরে আসিয়া যাহারা সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় একজনের উক্তি। দম্ভ অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাতির জন্য জীবন বিসর্জ্জনের সাহস ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা আজি এখানে মরিলে ইত্যাদি—আমিয়ট প্রমুখ ইংরেজগণ ইচ্ছা করিলে নিজেদের প্রাণ বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু ইংরেজের রাজ্যস্থাপনের জন্যই তাহাদের মৃত্যু প্রযোজন ইহা তাহারা সেদিন বুঝিয়াছিল। তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী সমস্ত ইংরেজকে নবাবের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল—দুর্ভাগ্য যেন দলনীকে প্রতি পদে অনুসরণ করিতেছে। স্বামীর কল্যাণের আশায় সে গেল নিজের ভ্রাতার কাছে, সেই ভাই করিল অপ্রত্যাশিত আচরণ। রাজপথে অসহায়ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে আশ্রয় পাইল এক বাড়ীতে—যেখানে আর এক সর্ব্বনাশ উদ্যত হইয়া আছে। শৈবলিনী ভ্রমে তাহাকে ইংরেজেরা লইয়া চলিল। উদ্ধারের উপায় হইয়াছে মনে করিয়া কত আশায়, কত বিশ্বাসে সে তীরে নামিল, কিন্তু তাহার অনুমান মিথ্যা হইল ; নৌকা চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মুঙ্গেরের অট্টালিকায় জগৎশেঠরা দুই ভাই স্বরূপচান্দ ও মাহতাবচান্দ নবাবের নজরবন্দী হইয়া বাস করিতেছিলেন। ইংরেজের সহিত নবাবের যুদ্ধায়োজন আরম্ভ হইয়াছে। গুরুগণ খাঁর আন্তরিক অভিপ্রায় যুদ্ধ বাধুক, যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই হীনবল হইলে তিনি বাংলার অধীশ্বর হইবেন। ইহার জন্য প্রয়োজন সৈন্যগণকে বশীভূত রাখিবার জন্য প্রচুর অর্থ। শেঠযুগল পক্ষে থাকিয়া সহায় না হইলে কার্যসিদ্ধি অসম্ভব। শেঠেরাও মীর কাসেমের পতন চায়। গুরুগণ খাঁর সহিত শেঠদের যাহাতে পরামর্শ হইতে পারে তাহার জন্য জগৎশেঠরা তাঁহাদের বাসস্থানে একটি উৎসবের

আয়োজন করিয়াছেন—নবাবের অমাত্যগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন—গুর্‌গণ খাঁরও নিমন্ত্রণ হইয়াছে। নবাব যাহাতে কোনও সন্দেহ করিতে না পারেন তাহার জন্য এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য গুর্‌গণ খাঁ নবাবের অনুমতি লইয়া আসিয়াছে। নৃত্যগীত চলিতে লাগিল—তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গুর্‌গণ খাঁ আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল—নবাবের উচ্ছেদসাধন তাহার লক্ষ্য—গুর্‌গণ খাঁ কায়িক পরিশ্রম করিবে কিন্তু টাকা যোগাইতে হইবে শেঠযুগলকে। শেঠেরা রাজী—তাহাদের টাকা মারা না পড়ে কেবল এইটিই তাহারা চায়। আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠিল—প্রতাপ রায় নামক একজন বাঙালী যুবক ইংরেজগণের উচ্ছেদসাধনের জন্য শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাকে হাত করা প্রয়োজন। কিন্তু ইংরেজগণের উপর প্রতাপ রায়ের ক্রোধের কারণ কি ইহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

এই দৃশ্যটি অভিনব কল্পনা সমৃদ্ধিতে অপূর্ব্ব। একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের স্বল্পাক্ষর বর্ণনার মধ্যে নবাবের ভবিষ্যৎ, বাংলার ভবিষ্যৎ, আসন্ন যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের আভাস চমৎকার ফুটিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগের নাটকে (সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাসেম) এই দৃশ্যটির প্রভাব অনস্বীকার্য্য।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—সৌন্দর্য্য ও বিলাস, রুচি ও ঐশ্বর্য্য যখন সামঞ্জস্য গ্রথিত হইয়া মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখন বলা হয় উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। শেঠদিগের সুসজ্জিত অট্টালিকার অপরূপ সজ্জা, মর্ম্মর স্তম্ভগাত্রে বিচ্ছুরিত সহস্র দীপরশ্মি 'হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা,' সুবেশা নর্ত্তকী ও গায়িকাগণের সমুজ্জ্বল রূপসজ্জা এইগুলি হইল 'উজ্জ্বল' আর মধুর কণ্ঠনিসৃত সঙ্গীত ধ্বনি হইল 'মধুর'।

নৃত্যগীত উপলক্ষমাত্র—শেঠদিগের সহিত গুর্‌গণ খাঁ কি উপলক্ষ্য করিয়া মিলিত হইতে পারেন? শেঠরা মীর কাসেমের সন্দেহভাজন, মুঙ্গেরে তাহারা নবাবের নজরবন্দী হইয়া বাস করিতেছ আর গুর্‌গণ খাঁ নবাবের সেনাপতি; বিনা কারণে মিলিত হইলে নবাবের সন্দেহ হইতে পারে, সেইজন্য নৃত্যগীত উপলক্ষ করিয়া শেঠরা গুর্‌গণ খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। একা গুর্‌গণ খাঁ নিমন্ত্রিত হইলে সন্দেহ হইতে পারে, সেইজন্য নবাবের উচ্চপদস্থ সকল কর্ম্মচারীই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

গুর্‌গণ খাঁ ও মাহতাবচন্দের আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ চলিতেছিল যে ভাষায় সে ভাষা অন্যের বোধগম্য নয়। নূতন ব্যবসা পত্তন করা, কেবল শারীরিক পরিশ্রমে ব্যবসায় অংশীদার হওয়া প্রভৃতি কথা অন্যে শুনিলেও বিশেষ সন্দেহ করিতে পারিবে না। কিন্তু আসল কথা গুর্‌গণ খাঁ জগৎশেঠদের সহায়তায় মীর কাসেমের নবাবী শেষ করিয়া দিয়া নিজেই নবাব হইতে চায় এবং জগৎশেঠদেরও ইহাই কাম্য।

মীর কাসেমের সন্দেহভাজন হইয়া বাস করা তাহাদের পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, মীর কাসেমের উচ্ছেদ সাধন তাহাদের কাম্য। কিন্তু প্রতাপ রায় নামক একজন হিন্দু যে নবাবের পক্ষ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইতেছে, সে কোন্ লোভে, কিসের আশায় এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল না। এই সময় মনিয়া বাঈ গাহিতেছিল "গোরে গোরে মুখ পরা বেশর শোহে" অর্থাৎ সুন্দর মুখের উপর বেশর শোভা পাইতেছে।

প্রতাপের যুদ্ধোদ্যমের অন্তরালে কি কোনও সুন্দর মুখের প্রেরণা আছে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ তকি খাঁর প্রতি নবাবের গোপন আদেশ ছিল যে, ইংরেজের নৌকা হইতে দলনী বেগমকে উদ্ধার করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাতে হইবে। তকি খাঁর ধারণা ছিল ইংরেজগণ ধৃত বা হত হইলে বেগম আপনা হইতেই তাহার হাতে পড়িবে, সুতরাং পূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষ তৎপরতার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, বেগম ইংরেজগণের নৌকায় নাই তখন তকি খাঁ প্রমাদ গণিল। নবাবের রোষ হইতে সে নিজের প্রাণ বাঁচাইবে কি করিয়া? তখন তকি খাঁ বেগম সম্বন্ধে এক মিথ্যা পত্র রচনা করিয়া নবাবকে পাঠাইল। বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গিয়াছিল—তিনি আমিয়টের উপপত্নী হইয়া নৌকায় বাস করিতেছিলেন। বেগম নিজেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন এবং নৌকার মাঝি-মল্লারাও এই প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে। বেগম খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা যাইতে ইচ্ছুক।

এদিকে দলনী মুঙ্গেরে নবাবের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুঙ্গের গেলে তাহার মঙ্গল হইবে না—ইহা জানা সত্ত্বেও সে নবাবের নিকট যাইতে চায়। অন্যত্র মঙ্গল অপেক্ষা স্বামীর নিকট অমঙ্গলও তাহার কাম্য। সে মুর্শিদাবাদে তকি খাঁর নিকট গেল। তকি খাঁ এ পর্য্যন্ত কোন অবিশ্বাসের কাজ করে নাই, ইতিহাসে তকি খাঁ নবাবের একজন পরম বিশ্বাসী অনুরক্ত কর্ম্মচারীরূপে চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের অনুরোধে তকি খাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যত্র মঙ্গলাপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গল ভাল—দলনী কেবল নিজের প্রবল হৃদয়াবেগের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের উপদেশ বা অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া যাইতেছে এবং এমনি তাহার উপর ভাগ্যের পরিহাস যে, প্রতিবারই সে নূতনতর বিপদজালে জড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি তোমাকে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকির নিকট রাখিয়া আসি—ঠিক এই মুহূর্ত্তে দলনীর যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু দলনী তাহার আশ্রয়েই প্রেরিত হইল।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রতাপকে ছাড়িয়া শৈবলিনী যখন পলায়ন করিল তখন রমানন্দ স্বামী অলক্ষিতভাবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিতেছিলেন। রমানন্দ স্বামী ইহার পূর্ব্ব হইতেই ইংরেজের বহর অনুসরণ করিয়া তীরপথে আসিতেছিলেন। প্রতাপ-শৈবলিনী যে গঙ্গায় সাঁতার দিয়া পরস্পর কথা কহিয়াছিল তাহাও ইঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। এই পূর্ব্বকথা শেষ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে। শৈবলিনী যে একাকিনী পর্ব্বতারোহণ করিল, ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া বিপন্ন হইল, এবং অবশেষে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লাভ করিয়া প্রাণে বাঁচিল—তাহার সমুদয় বৃত্তান্তই রহস্যময় ছিল ; এখানে সেই রহস্যের সমাধান করা হইল।

শৈবলিনীর উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দ্রশেখর ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রমানন্দ স্বামী তাহাকে আশ্বাস দিয়া শৈবলিনীকে বেদগ্রাম লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন—তিনিও অনতিবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইবেন।

এই উপন্যাসে রমানন্দ স্বামীর অবতারণা করা হইয়াছে কেন? তিনি উপন্যাসে কি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন? উপন্যাস হইতে রমানন্দ স্বামীকে বাদ দিলে কি ক্ষতি হইত? বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে একখানি উপন্যাসে কেবল অলৌকিক শক্তি দেখাইবার জন্য একজন সন্ন্যাসীর অবতারণা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সন্ন্যাসী-প্রীতির নিদর্শন—এ কথা অশ্রদ্ধেয়। উপন্যাসে রমানন্দ স্বামীর সূক্ষ্মতর প্রয়োজন আছে। রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরের গুরু। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর পুনর্মিলনের জন্যই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে। শৈবলিনীর যে পাপ, তাহার স্বরূপ কি, এই কথা শৈবলিনীর মুখ হইতে জানিবার আর কোনও উপায় ছিল না। শৈবলিনী নিজে বলিয়াছে—আমার পাপ যে বলিবার নয়। প্রতাপের প্রতি অনুরাগ ও সেই অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া গৃহত্যাগ ছিল শৈবলিনীর অপরাধ। কিন্তু যে অবস্থায় সে ফষ্টরের সহিত এক নৌকায় ছিল, সে অবস্থায় তাহার দৈহিক বিশুদ্ধি যে অক্ষুণ্ণ ছিল এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দৈহিক শুচিতা যাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ গৃহত্যাগিনী কুলবধূকে সসম্মানে গৃহে স্থান দেওয়া অতিমাত্রায় বাস্তব-বিরোধী হইয়া উঠিত। সুতরাং শৈবলিনীর দৈহিক শুচিতা যে নষ্ট হয় নাই, একমাত্র মানস ব্যভিচার ছাড়া আর অন্য পাপ যে তাহাকে স্পর্শ করে নাই, ইহার বিশ্বাসযোগ্য

প্রমাণ চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য সকলের নিকটই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই রমানন্দ স্বামীর অবতারণা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দলনীর বিষপানে মৃত্যু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় ছিল। যে ভ্রান্তির বশে নবাব দলনীর মৃত্যুর আদেশ দিয়াছিলেন সেই বুদ্ধিভ্রংশের কথা, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ও বিশ্বস্ত জনের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পাইয়া বিনাশকালে নবাবের যে বিপরীতবুদ্ধি জন্মিয়াছিল তাহাও এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। নবাবের এই সময় বুদ্ধির বিকৃতি জন্মিতে লাগিল—কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর নবাব এমন কতকগুলি কাজ করিলেন যাহা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সামান্য কারণে বা বিনা কারণে তিনি অধীন লোকদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময় তকি খাঁ দলনী সম্বন্ধে যে মিথ্যা সংবাদ দিল নবাব তাহা বিশ্বাস করিলেন, দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বা তাহার কি বলিবার আছে তাহা শুনিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। উপর্য্যুপরি অপ্রত্যাশিত ভাগ্য বিপর্য্যয়ে বা দুর্ঘটনায় মানুষের মনে বিশ্বাসের মূল যখন শিথিল হইয়া যায়, দুর্ভাগ্য-লাঞ্ছিত সেই হতভাগ্য তখন অসম্ভবকেও সম্ভব বলিয়া মনে করে। নবাবের এই বুদ্ধিনাশ খুব শোচনীয় হইলেও অস্বাভাবিক নয়।

দলনী আসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল" ? —নবাব যে দলনীর প্রতি অপ্রসন্ন সে কথা তকি খাঁর মুখে শুনিয়া দলনী একটুও বিশ্বাস করে নাই।

দলনী পরোয়ানা পড়িয়া হাসিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন—নিজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা চোখে দেখিয়াও দলনী বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না যে নবাব ইহা পাঠাইয়াছেন।

আমার রাজার হুকুম আমি কেন পালন করিব না ?—দলনী সমস্ত শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া নবাব যে এই আদেশ দিয়াছেন তাহাও বুঝিয়াছে। সে দেহত্যাগ করিবে, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নয়, যে সাময়িক উত্তেজনা বা বুদ্ধিবিকৃতির বশে মানুষ আত্মহত্যা করে সে উত্তেজনা তাহার নাই। প্রভুর আদেশ পালন করিতে হইবে, সতীর পক্ষে স্বামীর আদেশ, রাজার আদেশ শিরোধার্য্য—এই বুদ্ধিতে দলনী বিষপান করিবে। সজ্ঞানে সহমরণের চিতার আগুনে দগ্ধ হওয়ার সঙ্গেই কেবল এই নীরব আত্মবলিদানের তুলনা হয়।

দলনীর অভিমান, ক্রোধ কিছুই নাই, কেবল এক দুঃখ রহিয়া গেল নবাবের আদেশ দলনী কিভাবে পালন করিল, তাহা নবাব নিজে দাঁড়াইয়া দেখিলেন না।

[তকি খাঁ ঐতিহাসিক চরিত্র। কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পক্ষ হইয়া সে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের অনুরোধে তকি খাঁর চরিত্রকে বিকৃত

করিয়াছেন, কাটোয়া যুদ্ধের পরও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং দলনীর হত্যাকারী বোধে নবাব স্বহস্তে তাহার প্রাণবধ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক চরিত্রের এইরূপ বিকৃতি নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কাটোয়ার পর গিরিয়া, গিরিয়ার পর শেষ যুদ্ধের জন্য নবাব উদয়নালায় প্রস্তুত হইয়া আছেন। কুলসম অকস্মাৎ শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখে নবাব দলনীর বৃত্তান্ত শুনিলেন। নবাবের মুখে কুলসম দলনীর বৃত্তান্ত শুনিল। শুনিয়া কুলসম স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া নবাবকে মূর্খ বলিয়া গালি দিল। বাস্তবিকই নবাব মূর্খ, ভাগ্যহীন, নহিলে দলনীর মত দেবী ছাড়িয়া যায়! দলনীর শোকে নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নবাব জনশূন্য দরবারের কক্ষে ভুমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছেদের আরম্ভে দুইটি যুদ্ধের কথা দুই ছত্রে শেষ হইয়াছে। এত সংক্ষেপে, এত তাড়াতাড়ি দুইটি যুদ্ধের কথা সারিয়া ফেলাতে অনেকে খুশী হইতে পারেন নাই। কাটোয়া ও গিরিয়ার যুদ্ধের বর্ণনা করিবার মত শক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু কেবল উল্লেখ করিয়াই তিনি বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিয়াছেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্তরালে নরনারীর হৃদয়-বিপ্লবের কথা বলাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য। যে সাম্রাজ্য সহস্র চেষ্টাতেও থাকিল না, তাহার প্রতি লেখকেরও কোন আকর্ষণ নাই, কিন্তু যে সাম্রাজ্য বিনা যত্নে টিকিত, যাহা এমনি করিয়া চোখের সামনে মিলাইয়া গেল, তাহার দিকে লেখক পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ দিলে, তাহাই মুখ্য হইয়া উঠিত, উপন্যাসের আসল জিনিষটি কেন্দ্রচ্যুত হইত।

দলনীর গল্পের আরম্ভটি চমৎকার, নাটকীয়। প্রথমেই নবাবকে মূর্খ বলিয়া সভাস্থ সকলকে সচকিত করিয়া দিয়া, দলনীর যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া কুলসম সকলকেই বিস্মিত করিয়া দিল। দলনী যে গুরুগণ খাঁর ভগিনী এ কথা কেহই জানিত না। তাই অসীম কৌতূহল লইয়া কুলসমের বাকী কথাগুলি শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তোমরা পার সুবা রক্ষা কর! আমি চলিলাম—জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, নিজের উপর ক্রোধ সমস্ত মিলিয়া নবাবকে এক মুহূর্তে রাজ্য, সিংহাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে। কোন্ আশায়, কিসের লোভে আর সংসারে থাকা?

নবাব শেষবারের মত আদেশ করিলেন, তকি খাঁ, ফষ্টর, শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরকে যদি সম্ভব হয় দরবারে হাজির করিতে! এইখানেই উপন্যাসের প্লটের দুর্ব্বলতা

প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার পরবর্তী ঘটনা সমাবেশ নবাবের মনে দলনীর সতীত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা জন্মাইবার জন্য। দলনীর নিষ্পাপত্ব সম্বন্ধে পাঠকের মনে কোন সন্দেহ নাই, সেইজন্য এই অংশ পাঠকের নিকট কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়, পীড়াদায়ক ও বিরক্তিকর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ফষ্টর পদচ্যুত হইয়া মনে করিল তাহার প্রতি অবিচার হইয়াছে। সে বিপক্ষ শিবিরে যোগ দিল। জন্ ষ্ট্যালকার্ট নাম লইয়া ফষ্টর মীর কাসেমের সেনাধ্যক্ষ সমরুর নিকট আসিল। কিন্তু কুলসম তাহাকে চিনিয়া ফেলাতে সে ধৃত হইয়া নবাবের নিকট নীত হইল।

"শেষের দিকে আখ্যায়িকার গতি যেন মন্থর হইয়া আসিয়াছে। দলনী যে নিষ্পাপ এবং শৈবলিনী যে ফষ্টরের উপপত্নী নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সকলকে একত্র করিয়াছেন। কুলসমকে দলনীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল। সে নবাবের নিকট উপস্থিত হইল। চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে বেদগ্রাম হইতে আনা হইল। শুধু ইহাদের কথাতেই হইবে না। শৈবলিনী ও কুলসমের সাক্ষ্যের সমর্থন করিবার জন্য ফষ্টরকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।" (সুবোধ সেনগুপ্ত)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বেদগ্রামে আসিয়াছে। তাহার মস্তিষ্কের বিকার তখনও কাটে নাই। সুন্দরীকে শৈবলিনী চিনিতে পারিল না— কথাবার্তা অর্থহীন নয়, তবে অসংলগ্ন। প্রতাপও চন্দ্রশেখরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। রমানন্দ স্বামীর উপদেশানুসারে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর উপর ঔষধ প্রয়োগ করিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ শৈবলিনীর উপর ঔষধ প্রয়োগ করা হইল। ঔষধ বিশেষ কিছু নয়, কমণ্ডলুর জল। চন্দ্রশেখর এই ঔষধ প্রয়োগের জন্য উপবাস করিয়া আত্মশুদ্ধি করিয়াছিলেন। শৈবলিনী শয্যায় শায়িত হইল, একটু একটু করিয়া জল তাহাকে খাওয়ানো হইল, শৈবলিনী সহজেই নিদ্রাভিভূত হইল। তখন ঘুমন্ত শৈবলিনীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—শৈবলিনী প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। ইহাতে শৈবলিনীর দৈহিক নিষ্পাপত্ব প্রতিপন্ন হইল—অভিভূত অবস্থায় মনের গুপ্ত কথা লুকাইবার কোনও সামর্থ্য শৈবলিনীর ছিল না। চন্দ্রশেখর সমস্তই বুঝিলেন।

এই যোগবল অনেকটা মেসমেরিজম্-এর মত। প্রবল ব্যক্তিত্ব দ্বারা, একাগ্রতা ও সংযমের সাহায্যে অন্য ব্যক্তির চেতনাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া তাহাকে দিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য করানো বা তাহার অবচেতন মনের ভিতর হইতে কথা বাহির করা

ইহা অলৌকিক হইলেও আমাদের দেশে নূতন নয়। ক্লোরোফরম্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার প্রথা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। শৈবলিনীর মনের যথার্থ অভিপ্রায় কি ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে জানিবার আর কোনও উপায় ছিল না, অথচ উহা জানা দরকার—উপন্যাসের এই গুরু প্রয়োজনের অনুরোধেই লেখককে এই অলৌকিকের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: নবাব মীর কাসেমের শেষ দরবার। ফষ্টর ও তকি খাঁ, কুলসম, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী সকলেই উপস্থিত। দলনী যে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ তাহা সকলেই বুঝিল। ফষ্টরকে দেখিয়া চন্দ্রশেখর শৈবলিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ফষ্টর প্রথম উত্তর দিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু রমানন্দ স্বামীর দৃষ্টির বশীভূত হইয়া শৈবলিনীর নিষ্পাপত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল।

এমন সময় ইংরেজের কামানের গোলা তাঁবুর মধ্যে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সকলে চারিদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। নবাব স্বহস্তে তকি খাঁকে অস্ত্রাঘাতে নিহত করিয়া বাহিরে আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: উপন্যাসের এই শেষ পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীকে সুখী করিবার জন্য প্রতাপের আত্মবলিদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দেখিয়া বিমনা হইলেন—চন্দ্রশেখর জ্ঞানী, সংযমী এবং আরও বহু সদগুণে অলঙ্কৃত, কিন্তু চন্দ্রশেখর মানুষ। প্রতাপ যে শৈবলিনীর প্রণয়ী, প্রতাপকে দেখিয়াই সে কথা চন্দ্রশেখরের মনে হইয়াছে এবং তাঁহার চিত্ত অতীত ঘটনাবলীর চিন্তায় ছুটিয়া চলিয়াছে, সেইজন্যই চন্দ্রশেখরের অন্যমনস্কতা। কিন্তু এই ভাব সাময়িক, বাস্তবিক প্রতাপের মহত্ত্বের ও সংযমের যে তুলনা নাই তাহা চন্দ্রশেখর জানিতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপকে দরবারের সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন।

প্রতাপ বিস্মিত হইয়া চন্দ্রশেখরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—প্রতাপ শৈবলিনীর কথা কিছুই জানে না, কেবল জানে যে, শৈবলিনীর রোগমুক্তির জন্য মহাপুরুষের ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছিল। অচেতন অবস্থায় শৈবলিনী যাহা বলিয়াছিল তাহা চন্দ্রশেখর গোপনে কেবল রমানন্দ স্বামীর নিকটই বলিয়াছিলেন। আর দরবারে ফষ্টর যাহা বলিয়াছে তাহাও প্রতাপের পক্ষে জানিবার সুযোগ হয় নাই।

কিন্তু সুখ আর আমার কপালে হইবে না—শৈবলিনী আরোগ্যলাভ করিতেছে না এই জন্য।

তোমার বাতুলতা কি কৃত্রিম—প্রতাপকে উদ্ধার করিবার সময় শৈবলিনী একবার পাগলিনী সাজিয়াছিল। প্রতাপের সেই কথা মনে হইল, তাই এই প্রশ্ন।

প্রতাপের মুখ প্রফুল্ল হইল—শৈবলিনীর রোগমুক্তি ঘটিয়াছে, চন্দ্রশেখর আবার সুখী হইবেন—এই কথা ভাবিয়া প্রতাপ আনন্দিত হইল।

মনের পাপ আবার লুকাইয়া রাখিয়া—শৈবলিনীর মনের পাপ যে তাহারই মুখ দিয়া তাহার অজ্ঞাতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, লুকাইবার যে আর কিছুই নাই, এ কথা শৈবলিনী জানে না, তাই এ প্রশ্ন।

আশীর্ব্বাদ করি তুমি এবার সুখী হও—প্রতাপের যোগ্য কথা।

স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কতদিন বশে থাকিবে জানি না—শৈবলিনী এত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও নিজের মনকে আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। তাহার ভয় আছে, প্রতাপ নিকটে থাকিলে, তাহার বাল্য-প্রণয় আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

আমার প্রয়োজন আছে—শৈবলিনীকে সুখী করিবার জন্য আত্মবিসর্জ্জনের প্রয়োজন।

সেই হাসি দেখিয়া রমানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইলেন—নিজের সংকল্প সিদ্ধির সমস্ত আয়োজন অনুকূল দেখিয়া সিদ্ধির আনন্দে যে হাসি দেখা যায় প্রতাপের মুখে সেই হাসি। কোনও বাধা, কোনও প্রলোভন তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবে না রমানন্দ স্বামী লোকচরিত্রে অভিজ্ঞ, শৈবলিনীর ব্যাপার সমস্তই জানেন, তিনি চিন্তিত হইলেন।

রমানন্দ স্বামীর চোখে জল আসিল—সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী লৌকিক সুখ-দুঃখের অনেক উর্দ্ধে, কিন্তু প্রতাপের এই সংযম ও আত্মবলি তাঁহার চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী?—প্রতাপের এই ভালবাসা সংসারে সফল হইল না, এই ভালবাসার জন্য প্রতাপ জীবন বিসর্জ্জন দিল। সমাজের চোখে এই ভালবাসা হয়তো পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যু-পথ-যাত্রী প্রতাপ আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—ভগবানের কাছেও কি সে দোষী থাকিয়া যাইবে? এ প্রশ্ন কেবল প্রতাপের নয়, প্রতাপের মুখ দিয়া শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের। শিল্পী বঙ্কিম সংস্কারক বঙ্কিমের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হন নাই বলিয়াই প্রশ্ন রহিয়া যায় সমাজের বিধানানুসারে শৈবলিনী-প্রতাপের মিলন হইল না, শৈবলিনী প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া গৃহত্যাগ করিল ও তাহার দণ্ড ভোগ করিল, কিন্তু প্রতাপের শৈবলিনীকে ভালবাসা কি ভগবানের চোখেও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে?

সমাপ্ত